বাংলাদেশ ঃ ভূমি অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলা (প্রথম খন্ড)

Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought, Series - 1

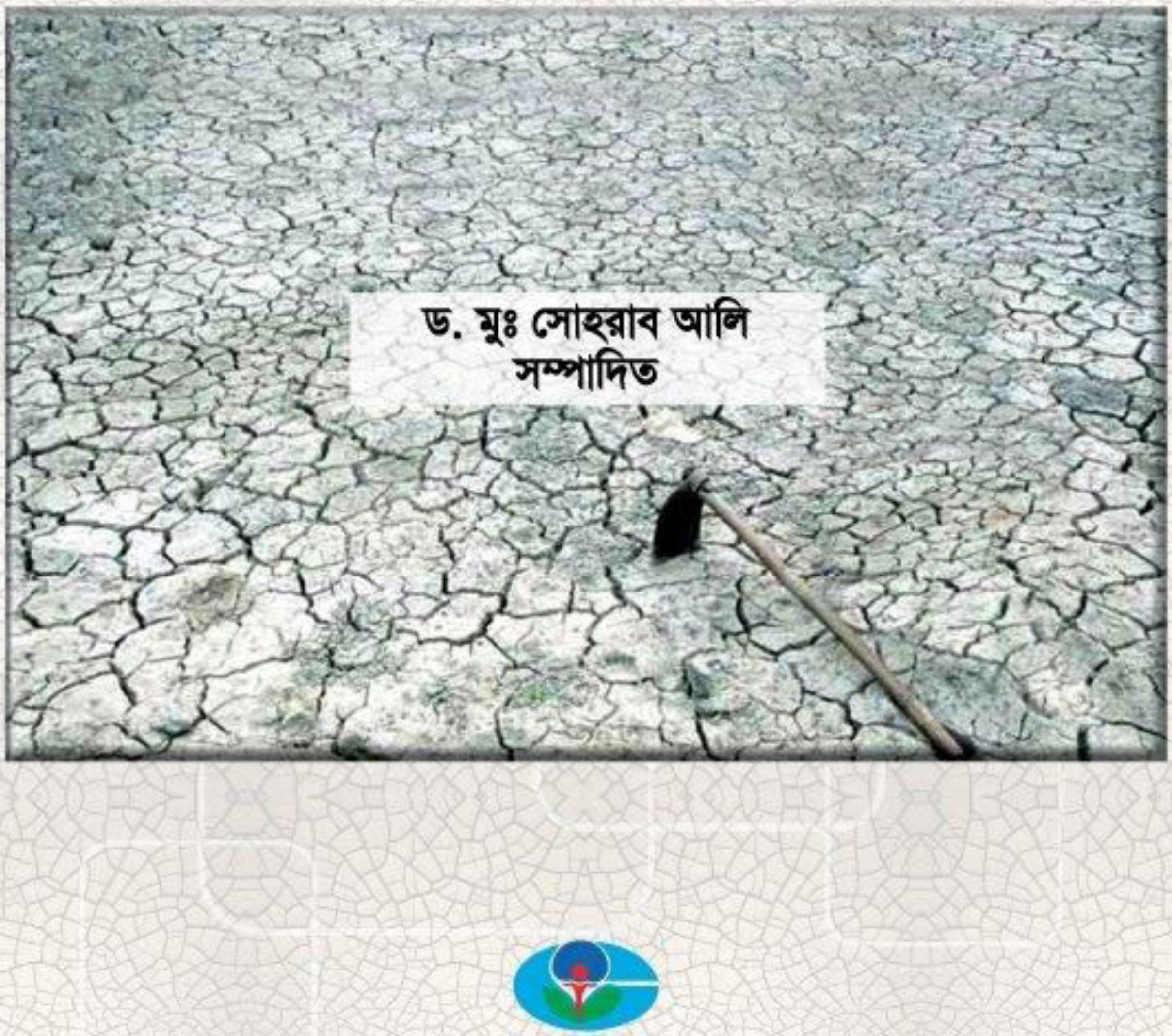

ড. মুঃ সোহরাব আলি
সম্পাদিত

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ঃ ভূমি অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলা (প্রথম খন্ড)

(Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought, Series- 1)

প্রকাশক ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর

ই-১৬, পরিবেশ ভবন, আগারগাঁও

ঢাকা-১২০৭

সম্পাদক ঃ

ড. মুঃ সোহরাব আলী, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

এবং

প্রকল্প পরিচালক, "Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework" প্রকল্প

বিশেষজ্ঞ সেবা ঃ

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

Website: www.doebd-dldd.org

প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০১৫

অলঙ্করণ ও মুদ্রণ ঃ

SPECTRUM advertising limited

[**Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought, Series- 1;** A compilation of nine papers in Bangla language with summary in English highlighting various aspects of DLDD situation in Bangladesh; **Edited by Dr. Md. Sohrab Ali**, Deputy Director and Project Director, 'Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework Project', **Department of Environment (DoE),** Ministry of Environment and Forestry (MoEF), GoB, E-16, Paribesh Bhaban, Agargaon, **Dhaka-1207; Published in August 2015]**

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায়	শিরোনাম	
	Foreword	Vii
	Preface	ix
	Acknowledgements	xi
	Abbreviations	xiii
প্রথম	বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা এবং ভূমি অবক্ষয় ঃ বর্তমান অবস্থা, পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় **(Drought and Soil Degradation in Barind Tract: Present Status, Impact on Environment and Management Options)** Dr. Md. Jahiruddin, Department of Soil Science, BAU, Mymensingh	১
দ্বিতীয়	বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল ধারা এবং ফসলক্রম ঃ ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা ও সমাধান **(Cropping Systems and Cropping Patterns in Drought-prone Regions of Bangladesh: Management Problems and their Solutions)** Dr. S. M. Altaf Hossain, Former Professor, Department of Agronomy, BAU, Mymensingh	১৫
তৃতীয়	বরেন্দ্র অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ভূমির অবক্ষয়ের প্রভাব **(Impact of High Temperature and Land Degradation on the Socio-economic Conditions of Common People in Barind Regions)** Dr. Sadika Haque, Associate Professor, Department of Agricultural Economics, BAU, Mymensingh	৩৩
চতুর্থ	বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ভূমি অবক্ষয়ের প্রভাব মোকাবেলা **(Livestock Development in Bangladesh: Combating the Impacts of High Temperature and Land Degradation)** Dr. Md. Nazrul Islam, Director General, BLRI, Savar, Dhaka	৪৫
পঞ্চম	বাংলাদেশে মৎস্য চাষ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা **(Bangladesh Fisheries: Combating Climate Chance Impacts)** Muhammad Zaher, Director General, BFRI, Mymesingh; Dr. Md. Zulfikar Ali, Senior Scientific Officer, BFRI, Mymensingh; and Dr. Md. Khalilur Rahman, Principal Scientific Officer, BFRI, Mymensingh	৫৫

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ **সিলেট অঞ্চলের হাওর এলাকায় শস্য ও শস্য-বিন্যাসের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব**
(Influences of Climate Change on Crops and Cropping Systems in the Haor Areas of Sylhet Regions)
Dr. Mohammad Noor Hossain Miah, Professor, Department of Agronomy & Haor Agriculture, SAU, Sylhet ৭১

সপ্তম **বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য প্রচলিত শস্য পদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ সুপারিশমালা**
(Conventional Cropping Systems in the Southern and South-western Regions of Bangladesh: Adapting to Climate Change)
Dr. Md. Alimur Rahman, SSO (Agronomy), Regional Agricultural Research Center, BARI, Barisal ৮১

অষ্টম **মরুময়তা, বনায়ন ও বন**
(Forest Conservation for Combating Desertification)
Farid Uddin Ahmed, Executive Director, Aronnok Foundation ১০৭

নবম **খরা ও ভূমি অবক্ষয় মোকাবেলায় জৈব সার ও জীবাণু সারের প্রয়োগ**
(Application of Organic Manures and Bio-fertilizers to Combat Drought and Land Degradation)
Dr. M.A. Sattar, Senior Consultant (DLDD), DoE, Dhaka ১১৩

সারণি-সূচি

(প্রথম সংখ্যা অধ্যায় ও দ্বিতীয় সংখ্যা সারণি-সংখ্যা নির্দেশক)

১.১ বাংলাদেশে বরেন্দ্রভূমির আয়তন, অবস্থান ও ভূমির প্রকার ৪
১.২ ১৯৮৯-২০১২ সময়কালে বরেন্দ্র এলাকায় পিএইচ, জৈব পদার্থ এবং জিংকের পরিমাণের পরিবর্তন ৮
১.৩ ১৯৬৭-২০০৯ সময়কালে এইজেড ২৭-এ কর্দম, জৈব কার্বন, নাইট্রোজেন এবং পটাশিয়ামের পরিবর্তন ৮
১.৪ রোপা আমন ও বোরো ধানের ফলনের ওপর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রভাব ১০
১.৫ বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে তিন বৎসর শেষে রাসায়নিক গুণাগুণের পরিবর্তন ১০
১.৬ গোদাগাড়ি এলাকায় ব্রি ধান ২৯ চাষে সেচের পরিমাণ এবং নেট আয় ১১
২.১ খরাপ্রবণ উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চলে উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে চলমান ফসলক্রমে সম্ভাবনাময় ফসলক্রম/ প্রযুক্তি / ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা তথা উপকারিতা (ছয়টি উপজেলার সারাংশ, ২০০৭) ২০

		পৃষ্ঠা
২.২	পানিসাশ্রয়ী / খরা সহনশীল ফসল ও উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন ফসল	২২
২.৩	মাঠ ফসলের ফসলক্রম অনুযায়ী জমির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা	২৪
২.৪	বাড়ির ভিটায় জমির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা	২৫
৪.১	১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	৪৭
৪.২	২০০৭ সালের সিডরে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ	৪৭
৪.৩	জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক ও প্রাণিখাদ্যের ওপর তার প্রভাব	৪৮
৫.১	বাংলাদেশে আঘাত হানা কয়েকটি সাইক্লোনের বিবরণ	৫৭
৫.২	হালদা নদীর রুইজাতীয় মাছের ডিম এবং রেণু উৎপাদনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট ব্যাঘাতের প্রভাব	৬০
৫.৩	বাংলাদেশের ৭৬১টি নদীর ভূ-গাঠনিক ও পরিবেশগত অবস্থা	৬১
৫.৪	তাপমাত্রা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রভাব ও করণীয়	৬৩
৫.৫	ভূমি অবক্ষয়/ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানি অনুপ্রবেশের প্রভাব ও করণীয়	৬৫
৬.১	হাওর অধ্যুষিত জেলাসমূহ, আয়তন, হাওর সংখ্যা	৭৫
৬.২	সিলেট বিভাগের চাষযোগ্য জমি ও পতিত জমি	৭৫
৬.৩	সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন	৭৬
৭.১	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস	৮৪
৭.২	অঞ্চলভিত্তিক ফসল পদ্ধতির আওতায় জমির পরিমাণ	৮৫
৭.৩	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চরের পরিমাণ	৮৬
৭.৪	বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার শ্রেণী এবং লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ	৮৬
৭.৫	বরিশাল জেলার ফসল বিন্যাস	৮৮
৭.৬	পিরোজপুর জেলার ফসল বিন্যাস	৮৯
৭.৭	ঝালকাঠি জেলার ফসল বিন্যাস	৮৯
৭.৮	পটুয়াখালি জেলার ফসল বিন্যাস	৯০
৭.৯	বরগুনা জেলার ফসল বিন্যাস	৯০
৭.১০	ভোলা জেলার ফসল বিন্যাস	৯০
৭.১১	গোপালগঞ্জ জেলার ফসল বিন্যাস	৯১
৭.১২	ফরিদপুর জেলার ফসল বিন্যাস	৯১
৭.১৩	মাদারীপুর জেলার ফসল বিন্যাস	৯২
৭.১৪	রাজবাড়ি জেলার ফসল বিন্যাস	৯২
৭.১৫	শরিয়তপুর জেলার ফসল বিন্যাস	৯৩
৭.১৬	খুলনা জেলার ফসল বিন্যাস	৯৩
৭.১৭	সাতক্ষীরা জেলার ফসল বিন্যাস	৯৪
৭.১৮	বাগেরহাট জেলার ফসল বিন্যাস	৯৪
৭.১৯	বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মৌসুম ভিত্তিক পতিত জমির পরিমাণ	৯৫
৭.২০	ফসলের আধুনিক / উন্নত / স্থানীয় জাতসমূহ	৯৬
৭.২১	জলবায়ু সহনশীল ফসলের জাত	৯৮

পৃষ্ঠা

৭.২২ পরিকল্পিত জলবায়ুর উপযোগী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্থানীয় / সৃজনশীল / লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ১০০

চিত্র-সূচি

(প্রথম সংখ্যা অধ্যায় ও দ্বিতীয় সংখ্যা চিত্র-সংখ্যা নির্দেশক)

১.১	বরেন্দ্রভূমির অবস্থান	৩
১.২	বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯১ হতে ২০১০ পর্যন্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	৫
১.৩	বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৬৪ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	৫
১.৪	বরেন্দ্র অঞ্চলে টেরাস ভূমি	৫
১.৫	রাজশাহী জেলায় এসপিআই	৬
১.৬	বরেন্দ্র এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নমুখী	৭
১.৭	খরা কালে ধানের মাঠে ফাটল	৭
১.৮	বিআইএডি প্রকল্প চালুর ফলে বোরো ধান চাষের প্রসার	৯
১.৯	আম-ধান আন্তঃফসল	১০
৬.১	পাঁচ বছরে সিলেটের গড় মাসিক বৃষ্টিপাত ১৯৯২-১৯৯৬ থেকে ২০০৭-২০১১	৭৭
৬.২	সিলেটের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৯৯৭ থেকে ২০১৪	৭৭
৬.৩	সিলেটের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের দিন ১৯৯৭ থেকে ২০১৪	৭৭
৬.৪	সিলেটের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ এবং এর ট্রেন্ড	৭৮
৬.৫	সিলেটের সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ এবং এর ট্রেন্ড	৭৮
৬.৬	সিলেটের বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ এবং এর ট্রেন্ড	৭৮
৬.৭	প্রাকৃতিক বন যা কুতুকছড়ির পানির উৎস	১১০
৬.৮	প্রাকৃতিক বন থেকে পানি সরাসরি এ ট্যাংকে জমা হয়	১১০

Foreword

As a low-lying agricultural country, Bangladesh is densely populated with varying degrees of deterioration of soil and water resources, biodiversity, and the atmosphere. Its geographical location at the bottom of three mighty river systems – the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna – having a long coastal belt with millions of people living only a few feet above sea level, has made the country vulnerable to storm surges from the Bay of Bengal and put it internationally at the forefront of the adverse climate change impacts. Moreover, the country has little control over the water resources as 92% annual run-offs by the rivers are from upper riparian country. The land use for agriculture here is, therefore, interlinked with the uncertainty of the onset and departure of the monsoon and total annual rainfall as well. The greatest environmental risk now arises from the intensifying global climate that adversely affects both human and natural systems. Human induced excess pressure on land and other natural resources makes the impacts of climate change even more severe.

The Government of Bangladesh is committed to bring about a continuous increase in terrestrial and aquatic productivity without detriment to the long-term production potential of the land and water resources of the country and thus, to ensure sustainable development with special focus on poverty reduction. Land degradation and drought form major natural hazards in Bangladesh covering an area of nearly 5.0 Mha of land in the north-western Bangladesh that falls far below the threshold of sustainable development because of its moderate to severe aridity. Due to prevalent hydrological cycle in the region, the chance of desertification here is remote, although the frequency and intensity of drought increased. The drier parts of the country are, in fact, characterized by irregular and low rainfall, high temperature, deforestation, desertification, land degradation and drought (DLDD), inadequacy of evapo-transpiration demand for various crops and most importantly, inadequate groundwater replenishment. Combating land degradation and drought is, therefore, a continuous war that must be carried on by raising awareness among the relevant stakeholders on land degradation issues, and by instilling in them a strong determination of purpose along with scientific insight, innovative ideas and creative urges necessary to win over the situation. And, it can by no means be lost, and must obviously be won.

As a part of NAP alignment process, the DoE conducted a series of regional workshops styled as "Field-level Thoughts on Formulation of National Action Program (NAP)" in six divisional cities between December 2014 and May 2015. The present volume is the first one of a series on combating land degradation and drought in Bangladesh, containing nine papers each dwelling on specific aspect of DLDD, presented in the said workshops by a band of highly experienced academics and researchers of international repute.

I believe, this compendium on land degradation and drought in Bangladesh will be useful not only in generating awareness and widening understanding of relevant national and international stakeholders, but also will provide food for thought to the planners and policy-makers in formulating the national strategy on land degradation issues. I welcome this noble venture of DoE and wish its all-out success.

(Md. Raisul Alam Mondal)
Director General
Department of Environment

New technologies can often increase the ability of even fragile ecosystems to produce food and other goods for humans, but burgeoning population bound by poverty and traditional techniques can drastically impair the land's life-support capacity.

- Erik P. Eckholm

Preface

Bangladesh is predominantly a flat delta stretching from the Himalayan piedmont plain in the north to the coast of Bay of Bengal in the south. Land is the prime resource of Bangladesh and key to humanity's survival as we obtain food, fiber, fuel and other materials from it. Land is a terrestrial bio-productivity system consisting of soil, vegetation and different ecological and hydrological processes that operate within the system. More precisely, land is not only the foundation of agriculture, but also the civilization itself. Further land is the ruler of people's mind, the dispenser of human destiny and the unending source of human peace and prosperity.

But land is being degraded all over the world due to huge population pressure and human interventions. Coaxing enough food from the earth has traditionally been guided by certain simple logic: plow more land, intensify labor, refine technique and the supply of food will grow commensurately. Any way, this has been the logic of humans, and not of nature. Out of desperation, ignorance, short-sightedness or greed, the humans are thus destroying the basis of their own livelihood as they violate the limits of natural systems. And the nature takes its own course by changing its climate, environment and the atmosphere resulting in reduced productivity along with loss of biodiversity and land degradation.

As per Article 1(f) of UNCCD, "land degradation" means reduction or loss of biological and economic productivity in arid, semi-arid and dry sub-humid areas, and complexity of rain-fed cropland, irrigated cropland or pastures, forests and woodlands resulting from land uses or from a process or combination of processes, including processes arising from human activities and habitation patterns. In Bangladesh, land degradation has become a cause for serious national concern, as huge area of country's land is affected by varying degrees of degradation, e.g. loss of soil fertility and soil organic matter (SOM), deterioration of physico-chemical and biological properties of soil due to drought, soil erosion, acidification, salinity, deforestation, loss of natural vegetation, accumulation of pollutants, habitat destruction, and above all, lowering of groundwater table. For sustainable agriculture, SOM content should ideally be around 5%, while Bangladesh's soil has on an average only 1% SOM. In some places it is less than 1% as in the Barind tracts.

Land use is a dynamic process and the changes in usage patterns are primarily driven by agricultural and water demands. It is also determined by the climatic factors, hydrology and availability of surface and groundwater for irrigation and other uses. Based on climate modeling exercises about future rainfall projections, two distinct features are predicted: (i) the monsoon will be wetter, and (ii) the winter rainfall will further diminish meaning (i) wetter monsoon would lead to increased flood vulnerability; (ii) drier winter months would give rise to higher evapo-transpiration in combination with further intensification of degree of aridity; and (iii) decline in winter rainfall would reduce flow in the rivers, which would aggravate saline ingress along the coastal region. The above phenomena clearly highlight the increased hazard susceptibility in terms of flood, drought and salinity ingress in Bangladesh. As for now, Bangladesh faces longer dry period and experiences seasonal and contingent drought. We know, drought causes the earth to parch, destroys the soil structure, and depletes groundwater and soil moisture. And, unavailability of freshwater drastically limits crop production in terms of cropping intensity and crop yield.

Currently, Bangladesh has to support about 160 million human populations. Its Net Cropped Area (NCA) was 9.14 currently Mha in 1982-83, which reduced to 8.08 Mha in 2000-01 and continues to decrease even at higher rate. With an estimated population of 170 million in 2020, the NCA may reduce to 7.5 Mha with a per capita NCA of 0.044 ha only, making the resource base for agriculture, forests and wetlands more marginalized and vulnerable. Therefore, the most critical challenge of the 21st century with the booming population would be in meeting the food-fuel-fodder needs of the country. This necessitates the urgency of controlling and preventing the processes of land degradation and drought to reduce poverty and promote sustainable development in Bangladesh.

As a signatory to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bangladesh is obliged to implement the decisions of Convention and to report on the outcomes of implementation to the Convention secretariat. To deal with Desertification, Land Degradation and Drought (DLDD) issues in Bangladesh, the Department of Environment (DoE) has been implementing the project titled "Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework".

The project aims at: (i) establishing linkage between NAP and the areas driving international support; (ii) making NAP a more versatile tool for ensuring sustainable land management (SLM) in Bangladesh; (iii) mainstreaming NAP with the ongoing national development activities and poverty eradication processes; and (iv) making effective contribution to control and prevent land degradation and to mitigate the adverse impacts of drought in order to support poverty reduction and environmental sustainability.

Under the auspices of this project, the DoE, therefore, conducted a series of regional day-long workshops entitled "Field Level Thoughts on Formulation of National Action Program (NAP)" in six divisional cities during December 2014 to May 2015. The broad objectives of workshop included awareness raising on DLDD and its mitigation, stock-taking of location-specific DLDD situation along with its climatological, meteorological, hydrological, biological and other relevant factors, assessment of causes and consequences of LDD to determine the priority areas for action, revitalization of locally driven consultative process to elaborate, coordinate and implement action programs of specific affected regions, and collection and compilation of information on the current state to update baseline of the country.

The Regional Workshops were attended by senior officials from relevant GOs, NGOs, civil societies, media personnel, researchers and academics from various research institutes and universities and members of farming communities. In the workshops, presentations were made by the resource persons on various aspects of land degradation, drought and rising temperature, cropping pattern, socio-economic situations, fish culture and fishery, livestock production, forestry and biofertilizer, haor agriculture, soil salinity, merine fishery, etc. The workshops had also threadbare discussion on charlands, plantation/cultivation, re-excavation and construction of waterbodies, water-logging, flash flood, soil erosion, mining of sand and stone, assessment of land degradation, salinity intrusion, siltation, deforestation and decline in soil fertility, awareness building and government initiatives. These regional workshops came up with concrete suggestions in respect of combating land degradation and drought in specific locations of the country and thus, widen the horizon of our knowledge and understanding about DLDD in Bangladesh.

It was conceived that holding of regional workshops would help us in understanding the field level thoughts on various aspects of land degradation and drought and thus, would take us close to those aching problems requiring immediate solutions on priority basis. But as we went ahead with it, we were brought before a vast realm of intricate systems consisting of innumerable processes acting continuously within the systems; and at one stage, it turned for us to be a journey to future to unveil the mystery of the unseen. As a matter of fact, combating DLDD is a continuous process as it undergoes continuous transformation within it, and therefore, we urgently felt the necessity of documenting the authentic voices of our own in the form of a series of publications. The present volume under the title "Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought, Series – 1" contains nine papers on different aspects of land degradation written by a highly committed team of experts drawn from various universities, research institutes and NGOs. This documentation is based entirely on the experiences and outcomes as gained in the regional workshops. The original papers have been written in Bangla, each containing a summary and title of the paper in English, to meet the needs of the national and international consumers. Same style has also been followed in naming of the book as the publication is intended to international readership as well. We hope, this book will be useful to those who are the real actors engaged in fighting out the maladies of land degradation and drought in home and abroad.

(Md. Sohrab Ali, Ph D)
Deputy Director, DoE and
Project Director, Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with
UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework Project

Acknowledgements

The present book on the state of land degradation and drought in Bangladesh is the first of its kind in terms of documenting the authentic voices of people as raised through interactions in a series of day-long regional workshops under the title "Field-level Thoughts on Formulation of National Action Program (NAP)" held recently in six divisional cities of the country. Hence, thanks and gratitude are owed to all of the stakeholders who participated in the workshops and contributed to it in various ways.

First and foremost, I would like to acknowledge my highest regards and gratitude to Mr. Md. Raisul Alam Mondal, Director General, Department of Environment (DoE) for constant guidance and all out support in favor of arranging these workshops in a befitting manner and for gracing each of them by his kind presence as the chief guest or the chairperson. My sincerest appreciations and gratitude are also due to Dr. Sultan Ahmed, Director (NRM), DoE for his being present in all of the workshops and adding liveliness and vigor to the technical discussions as moderator. I gratefully acknowledge here the help as received from Dr. M.A. Sattar, Senior Consultant (DLDD) attached to the project "Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Plan (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework". He played the key role in maintaining communications with resource persons and the division-level officials of DoE for finalization of respective workshop schedules.

I wish to acknowledge with enormous gratitude the contributing authors of this book for preparing the papers in their areas of expertise. Almost all of them took part in the workshop, except the authors on Bangladesh fisheries. The excellence as this book may have is primarily owed to them although it combines the field-level thoughts as expressed in the regional workshops. I also gratefully recall here the contributions made by the following resource persons who made their power-point presentations in their specialty areas in various regional workshops:

On Fisheries	:	M. Shariful Islam, SO, BFRI, Jessore
		Ashraful Haque, SO, BFRI, Patuakhali
		Rakibul Islam, SSO, BFRI, Paikgachha
		Ehsanul Karim, SO, MFRTC, Cox's Bazaar
On Salinity	:	Md. Shafiquzzaman, SSO, SRDI, Sylhet
		Bidhan Kumar Bhandari, PD, SRDI, Bagerhat
		Md. Jalal Uddin, PSO, SRDI, Chittagong
On Forestry	:	Jahir Uddin Ahmed. DFO, Khulna
On Cropping Patterns	:	Sheikh Mostafa Zaman, BARI, Khulna
On NAP	:	Motaleb Hossain Sarker, Director, CEGIS, Dhaka.

I am especially thankful for the expert service provided by Professor Abdur Razzaque of BAU in reviewing and upgrading the texts of this book and in maintaining an uncompromised standard of excellence. I also gratefully acknowledge the financial supports provided by the Global Environment Fund (GEF) to meet the costs of holding the regional workshops and publication of this document.

My sincerest thanks and gratitude are also due to the Divisional Commissioners, Additional Divisional Commissioners, Deputy Commissioners along with Directors and Deputy Directors of division-level DoE in six divisions of the country for the contributions they made in making the program a success.

Nevertheless, there are many other 'unsung heroes' behind the curtain who should have been acknowledged for their meritorious service and contributions – to all of them I say thanks and ask forgiveness for their not being singled out.

(Md. Sohrab Ali, Ph D)
Deputy Director, DoE and
Project Director, Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework Project

Abbreviations

AEZ	Agro-ecological Zone
AIS	Agricultural Information Service
ASA	Association of Social Advancement
AWD	Alternate Wetting and Drying
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BAU	Bangladesh Agricultural University
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BFRI	Bangladesh Fisheries Research Institute
BIADP	Bangladesh Integrated Area Development Project
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BLRI	Bangladesh Livestock Research Institute
BMDA	Barind Multi-purpose Development Authority
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BUP	Bangladesh Unnayan Parishad
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CEGIS	Centre for Environmental and Geographic Information Services
CFC	Chlorofluro- Carbon
CHT	Chittagong Hill Tracts
CI	Conventional Irrigation
COP	Conference of Parties
CRI	Climate Risk Index
DAE	Department of Agricultural Extention
DAP	Drought Adaptative Practice
DDSR	Dry Direct Seeded Rice
DEFRA	Dept. of Environment, Food and Rural Affairs (UK)
DFID	Department for International Development (UK)
DFO	Divisional Forests Officer
DLDD	Desertification, Land Degradation and Drought
DLS	Department of Livestock Services
DMB	Disaster Management Board
DoE	Department of Environment
DoF	Department of Fisheries
DTW	Deep Tube Well
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FAO	Food and Agriculture Organization
FCR	Food Conversion Ratio
FRG	Fertilizer Recommendations Guide
GOB	Government of Bangladesh
GCM	General Circulation Model
GDP	Gross Domestic Product
GFS	Gravitational Flow System
IAEA	International Atomic Energy Agency
IFPRI	International Food Policy Research Institute
IFAD	International Fund for Agricultural Development

IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPM	Integrated Pest Management
IPSA	Institute of Postgraduate Studies in Agriculture
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
IWM	Institute of Water Modeling
JICA	Japan International Cooperation Agency
LACC	Livelyhood Adaptation to Climate Change
LLP	Low Lift Pump
MFRTC	Marine Fisheries Research and Technology Center
Mha	Million hectares
MoA	Ministry of Agriculture
MoEF	Ministry of Environment and Forests
MoFL	Ministry of Fisheries and Livestock
NAP	National Action Program
NAPA	National Adaptation Program of Action
NARS	National Agricultural Research System
NCA	Net Cropped Area
NEMAP	National Environment Management Action Program
NGO	Non-Government Organization
PD	Project Director
PSO	Principal Scientific Officer
PTR-CI	Puddle-Transplanted Rice with Conventional Irrigation
SAU	Sylhet Agricultural University
SLM	Sustainable Land Management
SO	Scientific Officer
SOM	Soil Organic Matter
SPI	Standardized Precipitation Index
SSO	Senior Scientific Officer
SRDI	Soil Resources Development Institute
TMSS	Thengamara Mohila Samabay Samity
UNISDR	UN International Strategy for Disaster Reduction
UNDP	United Nations Development Program
UNCCD	United Nations Convention to combat Desertification
VCF	Village Common Forests
WMO	World Meteorological Organization

বাংলাদেশ ঃ ভূমি অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলা (প্রথম খন্ড)

Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought, Series - 1

v

Our only hope for achieving stability and sustainability is to imitate natural ecosystems as much as possible.

- Jack R. Harlan

প্রথম অধ্যায়

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা এবং ভূমি অবক্ষয় ঃ বর্তমান অবস্থা, পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং উত্তরণের উপায়

(Drought and Soil Degradation in Barind Tract: Present Status, Impact on Environment and Management Options)

ড. মোঃ জহির উদ্দীন [১]

Summary

Barind Tract ('Varendra Bhumi' in Bengali) has an area of 7727 sq km (772741 ha) extended over the north-west part of Bangladesh, containing parts of greater Rajshahi, Dinajpur, Rangpur and Bogra districts. Three AEZs, namely Level Barind Tract (AEZ 25), High Barind Tract (AEZ 26) and North-Eastern Barind Tract (AEZ 27) represent whole Barind Tract. The Barind is floored by the characteristic Pleistocene sediments known as the Madhupur (Barind) Clay. The Madhupur clay is reddish brown in color, oxidised, sticky and compact.

Barind areas have dry humid climate. During dry season, evapotranspiration exceeds rainfall, so water deficit arises. Scarcity of water is the main threat to agricultural productivity and people's livelihood in this area. The Barind Tract is recognized as a drought prone area. Causes of drought include inadequate monsoon rainfall, high temperature & evaporation, overexploitation of groundwater, Farakka barrage, siltation of riverbed, and lack of excavation of ponds, khals and kharis. With passage of time, groundwater table has declined posing a big threat to the sustainable environment in the Barind area.

Impacts of drought are diverse and can be classified into three areas - economic, environmental and social. Economic impacts include loss of crop production, diminishing reproductive capacity of cattle and poultry, and extinction of some fish species. Environmental impacts are due to degradation of natural resources (soil, water and forestry). Social impacts involve lack of safe drinking water, conflicts between water users and employment opportunity. There are some initiatives, although not adequate, at govt, non-govt. and community levels to cope with the drought situation. The Barind Integrated Area Development Project (BIADP), later renamed as the Barind Multipurpose Development Authority (BMDA), has provided irrigation facilities for Boro rice cultivation, along with tree planting and ponds and khals excavation programs. As an outcome of research initiative, several crop varieties have been developed e.g. BRRI dhan 56, 57, 58; BARI chola-5, BARI barley-6. However, govt. attention to drought is less compared to flood and cyclone disasters. As community initiatives, field crops cultivation at many places have been transferred into fruit tree cultivation e.g. mango, jujube, guava, etc.

Scope exists to sustain rice production using less water in Barind Tract following alternate wetting and drying (AWD) and dry direct seeded (DDSR) systems. Drought adaptive practices (DAP) may include public awareness program, conservation agriculture practices (minimum tillage with crop residue retention), supplemental irrigation in T. Aman rice season, cultivation of drought tolerant and short duration crops, and fruit tree cultivation.

[১] প্রফেসর, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সারসংক্ষেপ

বরেন্দ্র অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার ৭৭২৭ বর্গ কি.মি. (৭৭২৭৪১ হে.) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের তিনটি অঞ্চল যথা, সমতল বরেন্দ্র ভূমি (AEZ 25), উঁচু বরেন্দ্র ভূমি (AEZ 26) এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বরেন্দ্র ভূমি (AEZ 27) বরেন্দ্র এলাকার অন্তর্গত। মধুপুর কর্দম (Madhupur Clay) নামে পরিচিত প্লিস্টোসিন সেডিমেন্ট (Pleistocene Sediment) দ্বারা বরেন্দ্র ভূমি গঠিত। এই মাটি লালচে বাদামি বর্ণের, জারিত, আঠালো এবং শক্ত।

বরেন্দ্র এলাকার জলবায়ু শুষ্ক-আর্দ্র। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাস্পীয়-প্রস্বেদন বেশি হয় বলে পানির ঘাটতি দেখা যায়। পানির স্বল্পতা এলাকার কৃষি উৎপাদনশীলতা ও মানুষের জীবনযাত্রার প্রধান অন্তরায়। বরেন্দ্র ভূমি খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। খরার কারণ হলো- অপর্যাপ্ত মৌসুমি বৃষ্টিপাত, উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাস্পীভবন, ভূগর্ভস্থ পানির অধিক উত্তোলন, ফারাক্কা বাঁধ, নদীগর্ভে পলি জমা, এবং পুকুর, খাল ও খাড়ি খনন না করা। সময়ের সাথে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাওয়া বরেন্দ্র এলাকার টেকসই পরিবেশের জন্য বড় হুমকি।

খরার প্রভাব বহুমুখী যা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় - আর্থিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক। আর্থিক প্রভাব বলতে ফসল উৎপাদন কমে যাওয়া, গবাদিপশু ও পাখির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস এবং কিছু মাছের প্রজাতির বিলুপ্তি বোঝায়। পরিবেশগত প্রভাব বলতে প্রাকৃতিক সম্পদের (মৃত্তিকা, পানি এবং বন) অবক্ষয় এবং সামাজিক প্রভাব বলতে নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং কর্মসংস্থানের অভাব বোঝায়। খরা মোকাবেলায় সরকারি, বেসরকারি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে উদ্যোগ রয়েছে, যদিও তা অপর্যাপ্ত। বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BIADP), পরবর্তীতে যা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) নামে পরিচিত, থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি যথা, বোরো ধান চাষে সেচ, বৃক্ষ রোপণ এবং পুকুর ও খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল হিসেবে অনেক ফসলের জাত যেমন- ব্রি ধান ৫৬, ৫৭, ৫৮; বারি ছোলা-৫ এবং বারি বার্লি-৬ উদ্ভাবিত হয়েছে। যাহোক বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের তুলনায় খরা মোকাবেলা করার ব্যাপারে সরকারের মনোযোগ কম। কমিউনিটি উদ্যোগ হিসেবে কৃষকেরা মাঠ ফসলের আবাদ কমিয়ে দিয়ে ফলদ বৃক্ষ যেমন- আম, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি চাষ শুরু করেছে।

পর্যায়ক্রমিক ভিজা ও শুকানো (AWD) এবং শুষ্ক জমিতে সরাসরি বীজ বপন (DDSR) পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কম পানি ব্যবহার করে বরেন্দ্র এলাকায় ধান উৎপাদন করার সুযোগ বিদ্যমান। জন সাধারণের সচেতনতা কর্মসূচি, সংরক্ষণমূলক কৃষি প্রযুক্তির (conservation agriculture - ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে রাখা এবং কম চাষ) প্রয়োগ, রোপা আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ, খরা সহনশীল ও স্বল্প জীবনকালীন ফসল এবং ফলদ বৃক্ষ চাষ ইত্যাদি খরা অভিযোজনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

০১. বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিচিতি

১.১ বরেন্দ্র ভূমির অবস্থান

'বরেন্দ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের বর বা আশির্বাদ (বর + ইন্দ্র)। বরেন্দ্র ভূমি বাংলাদেশের একটি বৃহৎ ভূ-প্রাকৃতিক একক (Physiographic unit)। এটি পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা নদী এবং দক্ষিণে গঙ্গা নদী দিয়ে আবদ্ধ। এর আয়তন ৭৭২৭ বর্গ কি. মি. (৭৭২৭৪১ হে.) যা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কিয়দংশ, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত (চিত্র-১)। বরেন্দ্র ভূমি ২৪°২০´- ২৫°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২০´- ৮৯°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত।

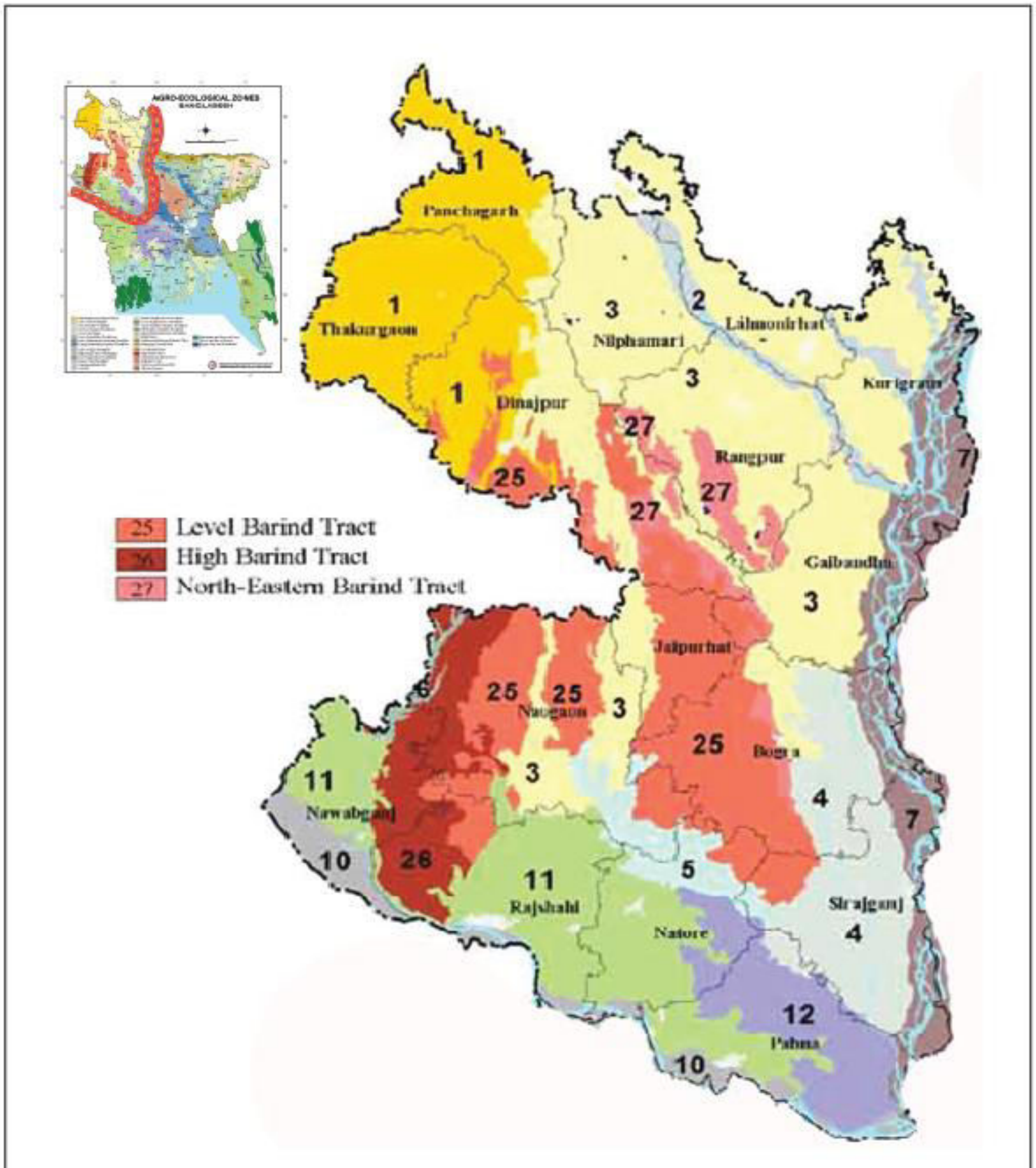

চিত্র ১। বরেন্দ্র ভূমির অবস্থান

বাংলাদেশের ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের মধ্যে তিনটি অঞ্চল তথা এইজেড ২৫, ২৬ ও ২৭ বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এদের আয়তন, অবস্থান ও ভূমির প্রকার সারণি-১ এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ১। বাংলাদেশে বরেন্দ্র ভূমির আয়তন, অবস্থান এবং ভূমির প্রকার (FRG-2012)

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড)	জেলা ও এলাকা		ভূমির প্রকার ও পরিমাণ	
	জেলা	এলাকা ('০০ হে.)	ভূমির প্রকার	পরিমাণ (%)
২৫. সমতল বরেন্দ্র ভূমি (৫০৪৮৫১ হে)	নওগাঁ	১৪০৮	উঁচু ভূমি	৩০
	বগুড়া	১১৮২	মধ্যম উঁচু ভূমি	৫৫
	দিনাজপুর	১০৪০	মধ্যম নিচু ভূমি	৪
	জয়পুরহাট	৭২৯	নিচু ভূমি	২
	সিরাজগঞ্জ	১৯৩	বসতবাড়ি + জলাশয়	৯
	নাটোর	১৮৬		
	রাজশাহী	১৫৮		
	গাইবান্ধা	৯৪		
	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫০		
২৬. উঁচু বরেন্দ্র ভূমি (১৫৯৯৬৪ হে.)	নওগাঁ	৬২৩	উঁচু ভূমি	৯৩
	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫০২	মধ্যম উঁচু ভূমি	১
	রাজশাহী	৪৭৫	বসতবাড়ি + জলাশয়	৬
২৭. উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বরেন্দ্র ভূমি (১০৭৯২৬ হে.)	রংপুর	৪৬৬	উঁচু ভূমি	৩৬
	দিনাজপুর	৩৭৪	মধ্যম উঁচু ভূমি	৫৬
	বগুড়া	১৬১	মধ্যম নিচু ভূমি	১
	গাইবান্ধা	৭২	বসতবাড়ি + জলাশয়	৭

১.২ জলবায়ু

জলবায়ুগতভাবে বরেন্দ্র এলাকা শুষ্ক-আর্দ্র জোন-এর অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হয় এবং এক বছর থেকে আরেক বছরে ভিন্নতা দেখা দেয়। উদাহরণ হিসেবে ২০০০ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৬৯০ মি.মি., ২০১০ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৭৯৩ মি.মি.। ১৯৯১-২০০০ সময়কালের গড় বৃষ্টিপাত ১৪০০ মি.মি. যেখানে বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ২৩০০ মি.মি. (চিত্র-২)। প্রায় ৮৭% বৃষ্টিপাত হয় মৌসুমি ঋতুতে (জুন-অক্টোবর) এবং অবশিষ্ট ১৩% বৃষ্টিপাত হয় শুকনা মৌসুমে (নভেম্বর-মে)। গরম মৌসুমে বরেন্দ্র এলাকার গড় তাপমাত্রা ২৫০-৩৫০ সে. এবং ঠান্ডা মৌসুমে ৯০-১৫০ সে. (Habiba, 2012) (চিত্র-৩)। শুকনা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাষ্পীয়-প্রস্বেদন বেশি হয় বলে পানির ঘাটতি দেখা দেয় এবং তা ফসলের চাহিদা মেটাতে পারে না। বরেন্দ্র ভূমি খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। জিসিএম (GCM) এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভবিষ্যতে অধিক গরম দিন এবং গরম হাওয়া, দীর্ঘ শুষ্ক সময় এবং অধিক খরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

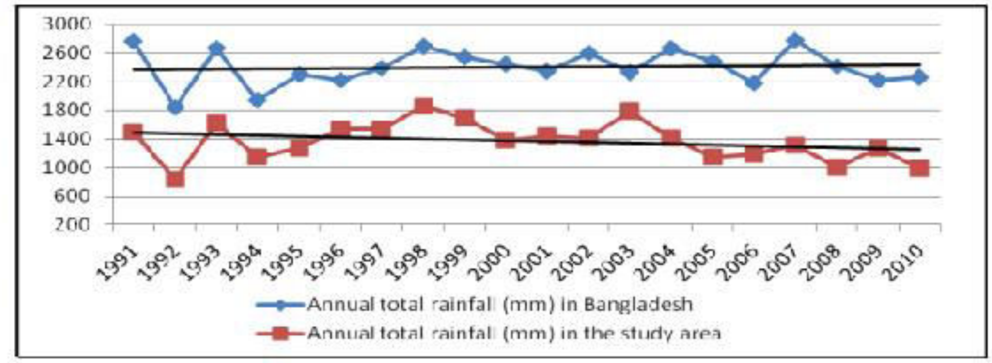

চিত্র ২। বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (উৎস **ঃ Habiba, 2012**)

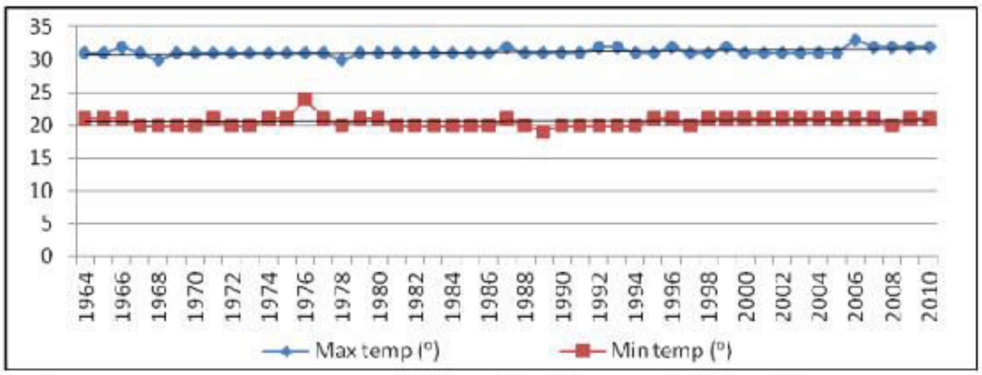

চিত্র ৩ । বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৬৪ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (উৎস **ঃ Habiba, 2012**)

১.৩ ভূমি ও মাটি

বরেন্দ্র ভূমি তার সংলগ্ন সমতল ভূমি অপেক্ষা অধিক উঁচু। যার ফলে সমতল ভূমি যখন পানিতে প্লাবিত হয়, তখন বরেন্দ্র ভূমি বন্যামুক্ত থাকে। তাই বৃষ্টির পানি এই এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জের প্রধান উৎস। বরেন্দ্র এলাকার প্রায় ৪৪% উঁচু ভূমি, ৪৪% মধ্যম উঁচু ভূমি, ৩% মধ্যম নিচু ভূমি এবং বাকি ৯% বসতবাড়ি ও জলাশয়। প্লিস্টোসিন সেডিমেন্ট (Pleistocene sediment) দ্বারা বরেন্দ্র ভূমি গঠিত যাকে 'মধুপুর ক্লে' বলে। মধুপুর ক্লে লালচে বাদামি, জারিত, আঠালো এবং দৃঢ় হয়। সমুন্নিত নির্দেশক নক্শা বা কন্টুয়ার (Contour) থেকে বোঝা যায়, বরেন্দ্র এলাকায় দুটি টেরাস লেভেল আছে - একটি ৪০ মিটারের মধ্যে এবং আরেকটি ১৯.৮ ও ২২.৯ মিটারের মধ্যে। অনেক জায়গায় ভূমি তরঙ্গের মতো উঁচুনিচু বা বন্ধুর (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪। বরেন্দ্র অঞ্চলে টেরাস ভূমি

০২. বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা

২.১ খরা

কোনো মৌসুমে ফসলের কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার চেয়ে কম আর্দ্রতা থাকার সময়কালকে খরা বলে (Brammer, 1987)। বাংলাদেশের প্রধান খরাগুলো ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৬ এবং ২০০৯ সালে সংঘটিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের খরা মারাত্মক ছিল যার ফলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের উত্তরাংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ২০০৬ সালের খরার কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ২৫-৩০% ধান উৎপাদন কমে যায় (Rahman *et al*, 2008)। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে এদেশে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত খরা হয়ে থাকে। যাহোক খরার সময়কাল বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। খরিফ মৌসুমে (০১ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর) উঁচু ভূমি বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় খরা দেখা যায়। উচ্চ তাপমাত্রার জন্য আগাম-খরিফ (১৬ মার্চ-৩০ জুন) ও রবি (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ) মৌসুমে খরা হয়। SPI (Standardized Precipitation Index) এর হিসাব অনুযায়ী রাজশাহীতে ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ২৩ বার খরা দেখা দিয়েছে (চিত্র ৫)।

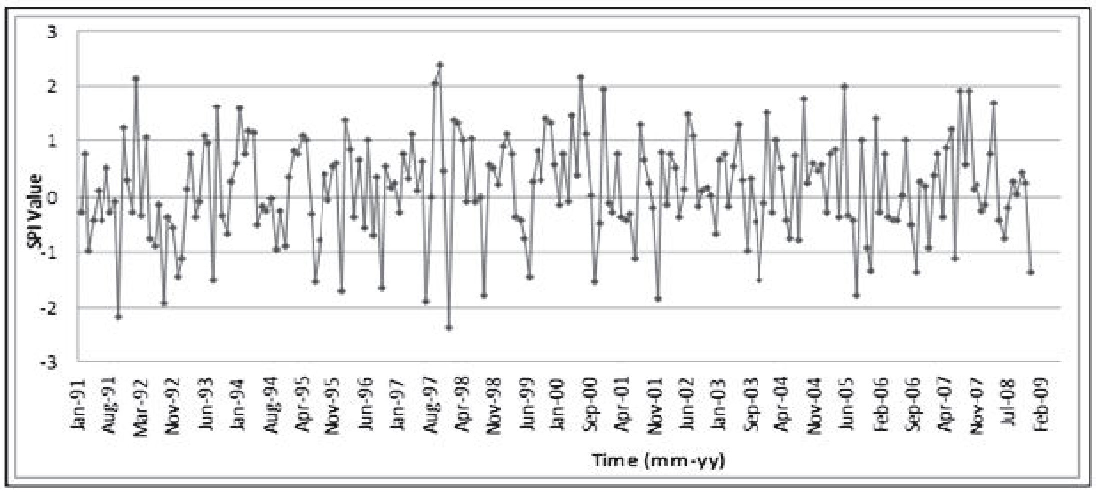

চিত্র ৫। রাজশাহী জেলায় এসপিআই (SPI) (উৎস ঃ Shaw *et al.* 2011)

২.২ খরার কারণ

খরা হলো একটি মৌসুমের দীর্ঘ সময়কাল ধরে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি, যার ফলে ওই মৌসুমে কৃষি ও অন্যান্য কাজ করার জন্য পানির ঘাটতি হয় (UNISDR, 2009)। খরার কারণ জলবায়ুর ভিন্নতা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অপ্রাপ্ততার সাথে সম্পর্কিত (Habiba *et al.*, 2011)।

অপর্যাপ্ত মৌসুমি বৃষ্টিপাত, উচ্চ তাপমাত্রা ও বাষ্পীভবন এবং বায়ুর উচ্চ গতি খরার কারণ হিসেবে চিহ্নিত। খরার অন্যান্য কারণ হলো ভূগর্ভস্থ পানির অধিক উত্তোলন, ফারাক্কা বাঁধ, নদীগর্ভে পলি জমা, বন নিধন এবং পুকুর, খাল ও খাড়ি খনন না করা।

ভূগর্ভস্থ পানির অধিক উত্তোলন খরার মাত্রাকে বৃদ্ধি করে। বোরো ধান চাষ অধিক হওয়ার কারণে সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার অধিক হারে বেড়েছে। যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেছে (Habiba *et al.*, 2011)। অপরদিকে কম বৃষ্টিপাতের জন্য বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জের সুযোগ সীমিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া বরেন্দ্র এলাকায় অনুকূল আবহাওয়া বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

২.৩ খরার প্রভাব

Tanner *et al.* (2007) উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের ২.৭ মিলিয়ন হে. এলাকায় বার্ষিক খরার ঝুঁকি রয়েছে যার ফলে সেখানে জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবার পাশাপাশি কিছু মাছের প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে এবং গবাদিপশু ও পাখির প্রজনন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। Wilhite and Vanyarkho (2000) এর মতে খরার প্রভাব বহুমুখী এবং একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক। অর্থনৈতিক প্রভাব বলতে সরাসরি ফসল, বন এবং মৎস্যসম্পদের ক্ষতি বোঝায়। পরিবেশগত প্রভাব হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি, বায়ু ও পানির গুণগত মানের অবনতি, বন উজাড়, ভূমিক্ষয় ও ভূমিপ্রকৃতির অবনতি। সামাজিক প্রভাব হিসেবে জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং কর্মসংস্থানের অভাব উল্লেখযোগ্য। খরা দারিদ্র্য, পানি সংকট এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে প্রভাবান্বিত ও তীব্রতর করে (UNISDR, 2009)।

ক) ভূগর্ভস্থ পানির ওপর প্রভাব

খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি অধিক উত্তোলনের কারণে পানিস্তর নিচে নেমে যায়। বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯৫-২০০৯ সময়কালে পানির স্তর ২-১০ মিটার নিচে নেমে গেছে (চিত্র ৬)। Rahman and Mahbub (2012) উল্লেখ করেন, রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে প্রতি বছর ০.৭২ ফুট হারে পানির স্তর নেমে যাচ্ছে।

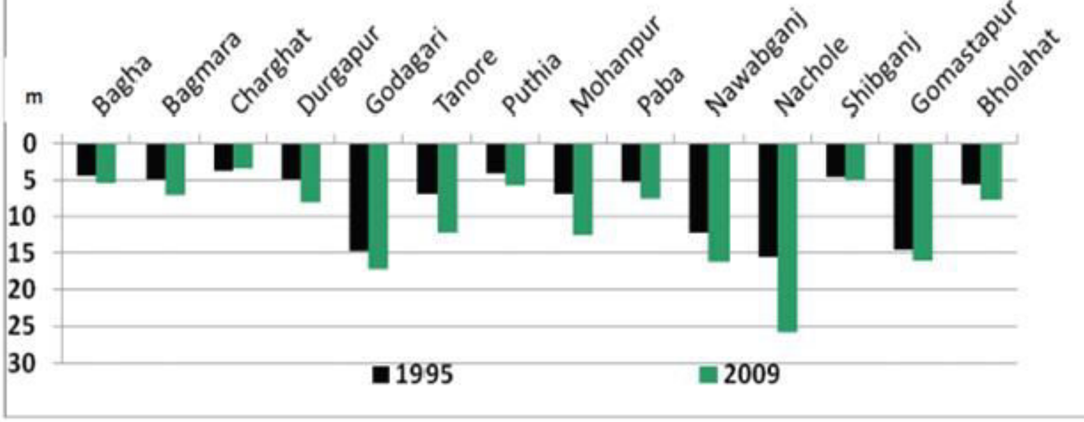

চিত্র ৬। বরেন্দ্র এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নমুখী (উৎস : BMDA, 2010)

খ) ভূমি ও মাটির ওপর প্রভাব

খরার প্রভাবে মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস পায়, মৃত্তিকা সংযুক্তি দুর্বল হয়, মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়, জৈব পদার্থ কমে যায় এবং মৃত্তিকা অণুজীবের কার্যকারিতা লোপ পায়। এটি পুকুরের পানিস্তর হ্রাস করে, পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এবং ভূমিপ্রকৃতির ক্ষতি করে। খরার সময়কালে মাটি ফেটে যায় এবং মৃত্তিকা সংযুক্তি ঢিলা হয় (চিত্র ৭)। এসময় জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) এর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সময়ের সাথে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ ও সহজলভ্য জিংক ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে (সারণি ২)।

Mia *et al.* (1993) এর মতে এইজেড ২৬ এ ২০.৭% জৈব পদার্থ হ্রাস পেয়েছে (১.১৫% হতে ১.৪৫%), অপরদিকে ধান-ধান শস্যবিন্যাসে এইজেড ২৭ এ জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৩)।

সারণি ২। ১৯৮৯-২০১২ সময়কালে বরেন্দ্র এলাকায় পিএইচ, জৈব পদার্থ এবং জিংক-এর পরিমাণের পরিবর্তন
(উৎস ঃ FRG 1989, 1997, 2005 & 2012)

এইজেড	মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য	১৯৮৯	১৯৯৭	২০০৫	২০১২
২৫	পিএইচ	৫.০-৫.৭	৫.০-৫.৭	৪.৮-৭.১	৪.৭-৭.২
	জৈব পদার্থ	কম	কম	বেশি কম-কম	কম
	জিংক	মাঝারি-বেশি	মাঝারি-বেশি	কম-মাঝারি	কম-মাঝারি
২৬	পিএইচ	৪.৮-৫.৯	৪.৮-৫.৯	৪.১-৭.৬	৪.০-৭.৫
	জৈব পদার্থ	কম	কম	বেশি কম-কম	কম
	জিংক	মাঝারি-বেশি	মাঝারি-বেশি	কম-মাঝারি	কম-মাঝারি
২৭	পিএইচ	৪.৮-৫.৬	৪.৮-৫.৬	৪.৬-৭.৪	৪.৪-৬.৪
	জৈব পদার্থ	কম	কম	বেশি কম-কম	কম
	জিংক	বেশি	বেশি	কম-মাঝারি	কম-মাঝারি

সারণি ৩। ১৯৬৭-২০০৯ সময়কালে এইজেড ২৭ এ কর্দম, জৈব কার্বন, নাইট্রোজেন এবং পটাশিয়াম এর পরিবর্তন
(উৎস ঃ Ali *et al.,* 1997a,b; Ali, 2009)

স্থান	মৃত্তিকা পর্যায়	বৎসর	কর্দম (%)	জৈব কার্বন (%)	নাইট্রোজেন (%)	পটাসিয়াম (me%)
পীরগঞ্জ (মাঝারি উঁচু ভূমি)	চন্দ্রা	১৯৬৭	১৪	০.৬৫	০.০৬৮	০.১৩
		১৯৯৫	১০	০.৮৩	০.০৯৪	০.০৭
		২০০৯	১০	১.০৭	০.০৮৯	০.০৭
	বেলাবো	১৯৬৭	২৪	০.৬৩	০.০৬৮	০.১৫
		১৯৯৫	১২	০.৮১	০.০৭৮	০.১৩
		২০০৯	১২	০.৭৭	০.০৮৫	০.১০

ভূমি ব্যবহার ঃ চন্দ্রার ক্ষেত্রে রোপা আমন-বোরো ধান এবং বেলাবোর ক্ষেত্রে আখ চাষ

গ) ফসল উৎপাদনের ওপর প্রভাব

খরা ফসল উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, প্রতি বছর রবি মৌসুমে ০.৪৫ মিলিয়ন হে., আগাম খরিফ মৌসুমে ০.৪০ মিলিয়ন হে. এবং খরিফ মৌসুমে ০.৩৪ মিলিয়ন হে. ভূমি খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে (Habiba, 2012)। খরা আবাদি ফসল, পানি সরবরাহ এবং উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়, খাদ্য ঘাটতি ঘটে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়। খরার কারণে যে সকল মানুষের জীবনযাপন ফসল উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল তারা অভাবগ্রস্ত হয়।

ঘ) গবাদিপশুর ওপর প্রভাব

খরা তাপপীড়ন (Heat stress) উৎপন্ন করে যা গবাদিপশু পাখির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে (Habiba, 2012)। খরার সময় চারণভূমি সবুজ না থাকায় গরু ও ছাগলের খাদ্য সংকট দেখা যায়। তাপপীড়নের কারণে গরু-ছাগল বিভিন্ন রোগ যেমন ব্ল্যাক কোয়ার্টার, অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়।

ঙ) মাছের ওপর প্রভাব

খরার কারণে সৃষ্ট তাপপীড়নের ফলে কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়। খরার সময় বেশির ভাগ পুকুর, খাড়ি এবং খাল শুকিয়ে যায়, ফলে মাছ চাষের অনুপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেখানে পানি থাকে সেখানে উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করায় মাছ অক্সিজেন সংকটে পড়ে।

চ) পানীয় জলের ওপর প্রভাব

খরার সময় মানুষ পানীয় ও রান্নার পানি সংকটে পড়ে। অপরদিকে পুকুরের পানি রোগ-জীবাণুতে দূষিত হয় যেমন, *E. coli*। পানি স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে অনেক জায়গায় হাত নলকূপ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

০৩. খরা ব্যবস্থাপনা

খরা মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় কমিউনিটি উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

৩.১ সরকারি উদ্যোগ

বরেন্দ্র এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি সেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে BADC এর অধীনে ১৯৮৫ সালে Barind Integrated Area Development Project (BIADP) গঠিত হয়। এই প্রকল্প ১৯৯২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে Barind Multi-purpose Development Authority (BMDA) বা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকল্প বরেন্দ্র এলাকার কৃষি ও পরিবেশের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। এই প্রকল্পের অধীনে হাজার হাজার গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, যেগুলো শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ধানে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় (চিত্র ৮)। এই প্রকল্পের আওতায় আরও কিছু কাজ যেমন বৃক্ষ রোপণ এবং পুকুর ও খাল খনন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়।

FAO এবং DAE-এর আওতায় Livelihood Adaptation to Climate Change (LACC) প্রকল্প খরাপ্রবণ এলাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেয় যেমন, ছোট পুকুরে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, বসত বাড়িতে সবজি চাষ এবং আম ও কুল চাষাবাদ।

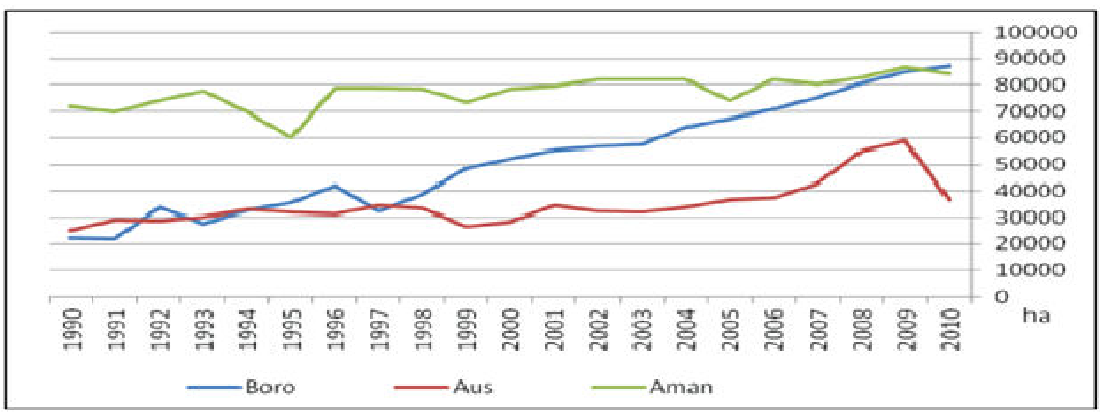

চিত্র ৮। বিআইএডি প্রকল্প (BIADP) চালুর ফলে বোরো ধান চাষের প্রসার

৩.২ বেসরকারি উদ্যোগ

বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, টিএমএসএস, আশা ও তৃণমূল খরাপ্রবণ এলাকায় কাজ করে, তবে তাদের কার্যক্রম প্রধানত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মধ্যেই সীমিত। তবে কারিতাস সবজি বাগানে সেচ, পুকুর খনন এবং খরা সহনশীল জাতের চাষ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৩.৩ কমিউনিটি উদ্যোগ

খরা মোকাবেলা করার জন্য কমিউনিটির লোকজন বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। অনেক এলাকায় মাঠ ফসল চাষের পরিবর্তে ফলদ বৃক্ষ যেমন, আম, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি চাষ করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে ছোট অবস্থায় ফল বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে ধান চাষ করা হয়।

৩.৪ গবেষণা উদ্যোগ

খরা সহনশীল জাত উন্নয়নের জন্য গবেষণা উদ্যোগ চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফসলের জাত যেমন ব্রি ধান ৫৬, ৫৭, ৫৮; বারি ছোলা-৫, বারি বার্লি-৬ জাত অবমুক্ত হয়েছে।

চিত্র ৯ । আম-ধান আন্তঃফসল

Afrad *et al.* (2014) এর পর্যবেক্ষণ অনুসারে, দক্ষ সার ব্যবস্থাপনা বিশেষত মুরগির বিষ্ঠা এবং সবুজ সার ব্যবহার ফসলের ফলন ও মৃত্তিকা উর্বরতায় বিশেষ করে জৈব পদার্থের উন্নয়নে অনুকূল প্রভাব ফেলে। তাই দক্ষ সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব পদার্থসহ মৃত্তিকা উর্বরতা উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে (সারণি ৪ এবং ৫)।

সারণি ৪ । রোপা আমন ও বোরো ধানের ফলনের ওপর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রভাব

চাষাবাদ পদ্ধতি	রোপা আমন ধান			বোরো ধান		
	ব্রিধান ৩৯	ব্রিধান ৪৯	বিনাধান ৭	ব্রিধান ২৮	ব্রিধান ২৯	নেরিকা
স্বল্প চাষ	৪.২৫	৪.৮৬	৪.১৬	৫.৬১	৫.৮৩	৪.১৮
সবুজ সার	৪.২৬	৫.০৪	৪.২৬	৫.৮৯	৬.৪৮	৪.১১
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ	৪.৩৫	৪.৬৬	৪.১০	৫.৯০	৬.৪০	৩.৮৭
কৃষক পদ্ধতি	৪.৩৩	৪.৯৩	৪.১৬	৫.৪৯	৫.৯২	৪.১০

(উৎস ঃ Afrad *et al.*, 2014)

সারণি ৫। বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে তিন বৎসর শেষে মাটির রাসায়নিক গুণাগুণের পরিবর্তন

চাষাবাদ পদ্ধতি	পি এইচ	জৈব কার্বন	নাইট্রোজেন	প্রাপ্ত ফসফরাস	প্রাপ্ত সালফার	প্রাপ্ত জিংক	পটাসিয়াম	ক্যালসিয়াম	ম্যাগনেসিয়াম
		(%)		মি. গ্রা./কি. গ্রা.			মি. তুল্য/১০০ গ্রাম		
স্বল্প চাষ	৬.৪৩	০.৮৭	০.০৮৫	২.৫৮	১২.৭০	১.১৫	০.১৪	৩.১৫	১.৯৮
সবুজ সার	৬.৫০	১.০১	০.১৪২	৪.৩৫	১৪.৯৫	১.৩৯	০.২১	৪.১০	২.১০
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ	৬.৭০	১.০৯	০.১৬৫	৬.০৮	১৬.২৫	১.৪১	০.২৫	৫.৯৫	২.৫
কৃষক পদ্ধতি	৬.২৮	০.৮৩	০.০৮৮	১.৯৩	১৩.৩৬	১.৩০	০.১৫	২.৭৫	১.৭০

(উৎস ঃ Afrad et al., 2014)

উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে (এইজেড ২৬) কম পানি ব্যবহার করে ধান উৎপাদন করার সুযোগ রয়েছে। Rahman *et al.* (2013) লক্ষ করেন যে, পর্যায়ক্রমিক ভিজা ও শুকানো (AWD) এবং শুষ্ক সরাসরি বীজবপন (DDSR) পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রচলিত PTR-CI পদ্ধতির চেয়ে ধান চাষে যথাক্রমে ২৫% ও ৫০% সেচ পানি কম লাগে (সারণি ৬)। DDSR পদ্ধতিতে ধানের ফলন প্রচলিত যা AWD সিস্টেম এর চেয়ে বেশি। DDSR পদ্ধতিতে বোরো ধানের উত্তম বপন সময় হলো মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি, কিন্তু এ সময় ধানের চারা মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজবপন করলে এ সমস্যার সমাধান করা যায় এবং ফসল রক্ষাসহ রোপা আমন-সরিষা- DDSR বোরো শস্য বিন্যাসে অধিক মুনাফা পাওয়া যায় (Rahman, 2014)।

সারণি ৬। গোদাগাড়ি এলাকায় ব্রিধান ২৯ চাষে সেচের পরিমাণ, ফসলের ফলন এবং নেট আয়

চাষ পদ্ধতি	সেচের সংখ্যা		সেচের পরিমাণ (মি. মি.)		ফলন (টা./হে.)		মোট আয় (টা.)	
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০০৯-১০	২০১০-১১
PTR-CI	১৭	১৬	১৪৪০	১৩৭৫	৩.৯০	৫.৩৬	১৬১৯৫	৫১০৬৫
AWD	১২	১২	১১০০	১০২০	৪.০৪	৫.৩৩	২০৭১৫	৫১৮১৫
DDSR	৯	৭	৭০০	৫৬০	৪.২৩	৬.০৯	২৫২৪০	৭৩১১৫

৪. উপসংহার

প্রধানত কম বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বরেন্দ্র ভূমি খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। পানির স্বল্পতা এই এলাকার কৃষি উৎপাদনশীলতা ও মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। খরার পরিণতিতে খাদ্য ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত, খাদ্যদানার মূল্য বৃদ্ধি, নিরাপদ পানীয় জলের সংকটসহ এবং কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের অভাব হয়। এই অবস্থায় স্থানীয় অভিযোজন পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত ও সমন্বয় করে নীতি-নির্ধারণ কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। খরা অভিযোজন কার্যক্রমের (DAP) মধ্যে জনসচেতনতা কর্মসূচি, সংরক্ষণমূলক কৃষি প্রযুক্তি (Conservation Agriculture), রোপা আমন ধানে সম্পূরক সেচ, খরা সহনশীল ও স্বল্প জীবনকালীন শস্য চাষ এবং ফলদ বৃক্ষ রোপণ অন্যতম।

৫. সুপারিশমালা

ক) ভূমি এবং মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

- সমন্বিত জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য স্বল্প চাষের সাথে শস্যের অবশিষ্টাংশ জমিতে রাখা।
- ডালফসল ভিত্তিক শস্যবিন্যাস।

খ) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

- খরাসহনশীল জাতের ধান চাষ যেমন, ব্রি ধান ৫৮।
- পর্যায়ক্রমিক ভিজা ও শুকানো (AWD) এবং শুষ্ক সরাসরি বীজবপন (DDSR) পদ্ধতি অনুসরণ।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর, খাল এবং খাড়ি পুনর্খনন।

গ) শস্যবিন্যাস

- স্বল্প জীবনকালীন ধানের জাত যেমন, বিনা ধান৭, ব্রিধান৪৯ এর চাষ।
- সম্পূরক সেচ।
- অবশিষ্ট মৃত্তিকা আর্দ্রতা ব্যবহার করে রবি ফসল (যেমন, সরিষা, ছোলা) চাষ।
- ফলদ বৃক্ষ চাষ।

ঘ) খরার জন্য সরকারের উদ্যোগ

- বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ অপেক্ষা খরার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ তুলনামূলক কম।
- খরা সম্পর্কিত নীতিমালা এবং খরার ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জি

Afrad, S. I., Rahman, G. K. M. M. and Rahman, M. M. 2014. Rice production in drought area of Bangladesh. KGF Final Report.

Ali, M.M., S.M. Saheed, Daisuke Kubota, Tsugiuki Masunaga and Toshiyuki Wakatsuki. 1997a. Soil degradation during the period 1967-1995 in Bangladesh. I. Carbon and Nitrogen. Soil Sci. Plant Nutri. 43(4): 863-878.

Ali, M.M., S.M. Saheed, Daisuke Kubota, Tsugiuki Masunaga and Toshiyuki Wakatsuki. 1997b. Soil degradation during the period 1967-1995 in Bangladesh. II. Selected chemical characters. Soil Sci. Plant Nutri. 43(4): 879-890.

Ali, M. M. 2009. Evaluation of soil fertility indices for assessment of and degradation situation in Bangladesh. Presented in the Research Review and Program Planning Workshop, held at BARC, Dhaka.

Ali, M. M. 2009. Evaluation of soil fertility indices for assessment of and degradation situation in Bangladesh. Presented in the Research Review and Program Planning Workshop, held at BARC, Dhaka.

BMDA, 2010. Barind Multipurpose Development Authority (BMDA) Head Quarter Office, Rajshahi.

Brammer, H. 1987. Drought in Bangladesh: Lessons for Planners and Administrators, Disasters, 11(1): 21-29.

FRG 1989. Fertilizer Recommendation Guide, BARC, Dhaka.

FRG 1997. Fertilizer Recommendation Guide, BARC, Dhaka.

FRG 2005. Fertilizer Recommendation Guide, BARC, Dhaka.

FRG 2012. Fertilizer Recommendation Guide, BARC, Dhaka.

Habiba, U., Shaw, R and Takeuchi, Y. 2011. Socio-economic Impact of Droughts in Bangladesh. Droughts in Asian Monsoon Region: *Community, Environment and Disaster Risk Management, Shaw, R. and Huy, N. (eds.),* Emerald Gr. Pub. Ltd. 8: 25-48.

Habiba, U. 2012. Enhancement of Drought Risk management Policy and Actions Incorporating farmer's Adaptive Practices in Northwestern Bangladesh. PhD Thesis. Graduate School of Global Environmental Studies. Kyoto Univ., Japan.

Mia, M.M.U., Habibullah, A.K.M. and Ali, M.F. 1993: Depletion of organic matter in upland soils of Bangladesh. In: Int. Seminar on Managing Red and Lateric Soils for Sustainable Agriculture, held in Sept. 24–28, 1993, Bangalore, India.

Rahman, M. M. and Mahbub, A. Q. M. 2012. Groundwater Depletion with Expansion of Irrigation in Barind Tract: A Case Study of Tanore Upazila. J. Water Resource and Protection 4:567-575.

Rahman, M. M., Sarkar, M. A. R., Masood, M. M., Uddin, M. J. and Ali, M. J. 2013. Dry Direct Seeded Boro Rice Production Technology. Dept. Agron., BAU.

Rahman, M. M. 2014. Development/validation and up-scaling of dry direct seeded boro rice system for improving crop productivity in areas with limited water supply. First Annual Progress Report, Project ID No. (FRP) : KGF BKGET / Code no. CGP TF 02-C. BARC, Dhaka.

Rahman, A., Alam, M., Alam, S. S., Uzzaman, M. R., Rashid, M. and Rabbani, G. 2008. Risks, Vulnerability and Adaptation in Bangladesh, Human Development Report 2007/08, Human Development Report Office OCCASIONAL PAPER, 2007/13.BARC, Dhaka.

Shaw, R., Nguyen, H., Habiba, U. and Takeuchi, Y. 2011. Overview and Characteristics of Asian Monsoon Drought: Droughts in Asian Monsoon Region: *Community, Environment and Disaster Risk Management, Shaw, R. and Huy, N. (eds.),* Emerald Group Pub. Ltd. 8: 1-24.

Tanner, T. M., Hassan, A., Islam K. M. N., Conway, D., Mechler, R., Ahmed, A. U., Alam M. 2007. ORCHID: piloting climate risk screening in DFID Bangladesh. Detailed research report. Institute of Development Studies, University of Sussex, UK.

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). 2009 Drought risk reduction framework and practices: Contributing to the Implementation of the Hyogo Framework for Action, UNISDR, Geneva.

Wilhite, D. A. and Vanyarkho, O. 2000. Drought: Pervasive Impacts of a Creeping Phenomenon (Chapter 18). In: D.A. Wilhite (ed.), Drought: A Global Assessment, Natural Hazards and Disasters Series, Routledge Pub., UK.

“No such thing as a free launch. Invest in healthy soils.”

- The Slogan of World Day to Combat Desertification, 2015.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল ধারা এবং ফসলক্রম ঃ ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা ও সমাধান

(Cropping Systems and Cropping Patterns in Drought Prone Regions of Barind Tract: Management Problems and Their Solutions)

ড. স. ম. আলতাফ হোসেন [১]

Summary

The High Barind Tract (AEZ 26), a representative example of drought prone Agro-ecological Region of Bangladesh has been selected as an area to study the problems and solutions of the management of cropping systems. The findings of the study would be more or less applicable to other drought prone areas of the country. The High Barind Tract is the driest part of the country. Average rainfall is between 1300-1600mm. Surface water is strictly limited. Ground water is scarce in the western hilly areas. Soil drainage is not good. Water is ponded during rainy season and soil becomes almost completely dried during dry season. Soil organic matter is very low, natural fertility is very poor with very low pH. Fallow-Fallow-Transplant Aman rice is the most predominant pattern of the cropping systems occupying 41.92% in Patnitola Upazila to 79.10% in Niamatpur Upazila i.e. the land remains fallow in two seasons in Rabi and Pre-kharif and Kharif due to scarcity of water although the region suffers from moderate to high level of food insecurity. Evidences indicate that productivity of crops under good managenent is highly profitable overcoming the stress condition of drought. Under the present circumstanes the productivity of the cropping patterns can be raised by increasing the water holding capacity of soil by addition of organic matter, use of organic, inorganic and chemical mulch, crop residues, cowdung, compost, water saving/drought tolerant crops, changing cropping pattern structure by introducing crops in seasonal fallow period (s). In this respect comprehensive research and development program should be undertaken by involving interdisciplinary team aiming at overall development of cropping systems of drought prone area of Bangladesh.

[১] প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ; প্রাক্তন ডীন, কৃষি অনুষদ ও সমন্বয়ক, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সারসংক্ষেপ

উঁচু বরেন্দ্র ভূমি কৃষি অঞ্চল (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৬) কে বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের ফসল ধারা ও ফসলক্রম ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা নিরূপণসহ সমাধান সংক্রান্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধখানি রচিত। এই প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্যান্য অঞ্চলের খরাপ্রবণ ফসলক্রম ও ফসল ধারা ব্যবস্থাপনার সাথে কমবেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

উঁচু বরেন্দ্র ভূমি দেশের শুষ্কতম অঞ্চল। গড় বৃষ্টিপাত ১৩০০-১৬০০ মি. মি.। ভূপৃষ্ঠস্থ পানির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। ভূগর্ভস্থ পানি পশ্চিমাংশে পাহাড়িয়া এলাকায় নগণ্য। মাটির নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়, ফলে বর্ষায় পানি জমে যায় ও শুষ্ক মৌসুমে একেবারে শুকিয়ে যায়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম, মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা কম ও খুবই অম্লযুক্ত। ফসল ধারার প্রধান অঙ্গ ফসলক্রমে (Crop Sequence/Cropping Pattern) পতিত-পতিত-রোপা আমন ধানের প্রাধান্য (Predominant Pattern) পরিলক্ষিত হয়। এই ফসলক্রমটি দখল করে রেখেছে পত্নীতলা উপজেলার- ৪১.৯২% এবং নিয়ামতপুর উপজেলার-৭৯.১০% এলাকা। অর্থাৎ উপজেলা ভেদে মৌসুমি পতিত জমির পরিমাণ ৪১.৯২-৭৯.১০%। শুধুমাত্র পানির অভাবে দু'দু'টি মৌসুমে একটি মাত্র ফসল ঘরে তোলা যায়, ফলে এই অঞ্চলটি মাঝারি থেকে চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। এটি প্রমাণিত যে, পানি থাকলে এবং যথাযথ ফসল ধারা ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করা হলে খরাজনিত চাপ সত্ত্বেও ফসলের উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিক-ভাবে বেশ লাভজনক করা সম্ভব। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ফসল ধারার উৎপাদনশীলতা সমস্যা নিরসন-কল্পে মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগসহ জৈব, অজৈব ও রাসায়নিক মালচ ব্যবহার, ফসলের উপাংশ, গোবর, আবর্জনা সার ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন, পানিসাশ্রয়ী খরা সহনশীল ফসল প্রবর্তন এবং চলমান ফসল ক্রমের কাঠামোয় বিশেষ করে মৌসুমি পতিতে (Seasonal Fallow) এ ধরনের ফসলের অন্তর্ভুক্তিকরণ বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে আন্তঃশৃংখলা বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্বে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য একটি ফসল ধারা তথা খামার ব্যবস্থা গবেষণা উন্নয়নের ওপর একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.০ সূচনা

পরিবেশ বিজ্ঞানে 'খরা' অভিধা প্রকৃতিতে পানির শূন্যতা তথা স্বল্পতার নির্দেশক। খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খামার ব্যবস্থা (Farming Systems) তথা ফসল ধারা বা ফসলক্রম ব্যবস্থাপনা (Cropping Systems)। খরাপ্রবণ এলাকার ফসল উৎপাদনকে বিবেচনায় নিলে সেচ সুবিধাবিহীন সমস্ত এলাকা এর আওতাভুক্ত হতে পারে যার ব্যাপকতা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি; আবার তা একটানা বিশাল অঞ্চলসহ বিচ্ছিন্নভাবে এলাকা ভিত্তিকও হতে পারে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি খরাপ্রবণ এলাকার ফসলক্রম তথা ফসল ধারা ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই এলাকাটি হচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চল - একটি খরাপ্রবণ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল। এই অঞ্চল চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও রাজশাহী জেলার বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৩টি উপজেলা যথা-গোদাগাড়ি, তানোর, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, মহাদেবপুর, মান্দা, ধামরহাট ও পত্নীতলা।

১.১ উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলের (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৬) বৈশিষ্ট্য

এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এটি দেশের শুষ্কতম অংশ, গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৩০০-১৪০০ মি.মি.। প্রায় সমগ্র অঞ্চলে দীর্ঘতম শীতকাল বিরাজ করে এবং অধিকতম দিন ৪০°সে উপর তাপ মাত্রা থাকে। অক্টোবরের শেষের দিক থেকে উত্তর অঞ্চলে ও ৫ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে তাপ মাত্রা ২০° সে-এর নিচে নেমে যায়।

১.১.১ উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা

ভূপৃষ্ঠ ঢালু হওয়া সত্ত্বেও এতদঞ্চলে মাটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। মাটির স্তরে টিরাসিং (terracing) এর কারণে মধুপুর কাদামাটির স্তরের গভীরতায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মাটির অনেকাংশে শক্ত চুন গুটি দৃষ্ট হয়। অঞ্চলটির উন্নয়ন অনেকগুলো প্রতিবন্ধক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) ভূপৃষ্ঠস্থিত পানির সরবরাহ অত্যন্ত সীমিত, (২) পশ্চিমাংশের পাহাড়িয়া এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির সরবরাহ খুবই নগণ্য, (৩) অনিশ্চিত আগাম মৌসুম ও মৌসুমোত্তর বৃষ্টিপাত, বর্ষায় মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে বৃষ্টি, (৪) মাটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বর্ষাকালে ভালো নয় আবার শুষ্ক মৌসুমে একেবার শুকিয়ে যায়, (৫) উপরিস্তরের মাটি পলি, ভিজা অবস্থায় তা সহজেই কাদা হয়ে যায়, কিন্তু নিম্নস্তরের মাটি বিশেষ করে লাঙ্গলে-সৃষ্ট-খাদের তলদেশ (ploughpan) বেশ শক্ত, (৬) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম তাছাড়া মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতাও কম এবং পিএইচ-ও কম, (৭) যোগাযোগ ব্যবস্থা নিম্নমানের, (৮) জমির মালিক বিত্তবান লোক (সাধারণত অনুপস্থিত), (৯) জমি কোথায়ও উঁচু, আবার কোথায় নিচু, (১০) সাধারণত অপর্যাপ্ত ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহের কারণে ব্যাপক ভিত্তিতে সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, যদিও বন্যার পানি নদী থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বেশ সুযোগ রয়েছে, এবং (১১) অঞ্চলটি মাঝারি থেকে চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে যার প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ অতি সংক্ষেপে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.১.২ পানিসম্পদের চিত্র

উঁচু বরেন্দ্র ভূমি অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠস্থ পানিসম্পদের প্রধান উৎস নদী, নালা, খাল, বিল, খাড়ি, পুকুর, ছোট ছোট জলাশয় ইত্যাদি। পদ্মা, মহানন্দা, পাগলা, পুনর্ভবা এবং আত্রাই নদী এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবহমান। বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাজামজা পুকুরসহ ভালো পুকুর রয়েছে যার অধিকাংশই শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায়। ঐ সমস্ত উৎস থেকে পানি পাওয়ার পাম্প (LLP) দ্বারা ফসলে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে। উঁচু বরেন্দ্র ভূমিতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২০-৩০ মিটারের মধ্যে পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫০-১৫০০ মি. মি.।

গত দুই দশক পূর্বে পানি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে চালু হয় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Barind Multipurpose Development Authority (BMDA)। BMDA রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বিশেষ করে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় ৫০০ গভীর নলকূপ দ্বারা ভূগর্ভ হতে উত্তোলিত পানির সাথে এ পর্যন্ত ১৪,৬২০টি অগভীর নলকূপসহ ১৪,১০৮টি পাওয়ার পাম্প সংযোগ দানের ফলে সেচের জমির পরিমাণ ৫৯৩,০৮৫ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। পুকুর ও খাল খনন কর্মসূচির আওতায় ২,৯৪৪টি হাজামজা পুকুর ও ১৩১৯ কি. মি. হাজামজা খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। খালের উজানে ৬৪৯টি ক্রসড্যামও নির্মিত হয়েছে। দুইশত চার কোটি টাকার মতো একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর আওতায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সহ সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের উন্নয়ন করা হচ্ছে (বাসস, ২০১৪ জাকিরের উদ্ধৃতি থেকে)।

১.২ খামার ব্যবস্থার চিত্র

খরার প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য কৃষকেরা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে খামার ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য তাঁরা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি হলো ঃ সেচের পানির স্বল্পতা, জমির মালিকানা বৈষম্য (বর্গাপ্রথার আধিক্য), জমির বন্ধুরতা, মাটিতে জৈব পদার্থের স্বল্পতা ও অনুর্বরতা। এ ছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, খামার পরিবারের জীবন ধারণের জন্য কৃষি ও অকৃষি কাজে শ্রম বিক্রয় ও এর সন্ধানে তাদের সদাব্যাপৃত থাকতে হয়।

খামার ব্যবস্থা মিশ্র এবং বেশ কয়েকটি পণ্য উৎপাদনের সমাহার যথা- ফসল, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, ছাগল, কোথাও কোথাও মাছের চাষ ইত্যাদি। বৃষ্টিপাতের ধরন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা মিলে সর্বত্র মিশ্র খামার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

২.০ ফসল ধারা ও ফসলক্রম (Cropping Systems and Cropping Pattern)

২.১ মাঠ ফসল

বাংলাদেশে খামার ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হলো এর ফসল ধারা তথা ফসলক্রম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাছ উৎপাদন এবং অকৃষিজ অঙ্গ যেমন শ্রম বিক্রয় ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে শুধু বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকার ফসল ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফসল ধারার প্রধান উপাঙ্গ ফসলক্রম, যা এক খন্ড জমির এক বছরের ক্রম অনুসারে ফসলের বিন্যাস। ক্রমটি রবি-খরিফ১-খরিফ২ অনুযায়ী সাজানো হয়ে থাকে।

পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান প্রধান ফসলক্রম যা শতকরা (রবি-খরিফ১) ৫০ ভাগেরও বেশি জমি দখল করে রেখেছে। এই ফসলক্রম গোদাগাড়িতে প্রায় ৪২% ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ৭৯% এর বেশি জমি চাষের আওতায় রয়েছে (সংযুক্তি ১ ও ৩)। অন্যান্য ফসল যথা সরিষা, যব, ছোলা, গম ইত্যাদি সংবলিত ফসলক্রমের চাষ সীমিত আকারে করা হয়ে থাকে। কয়েক দশক ধরে আগাম টমেটোর চাষ ব্যাপকভাবে গোদাগাড়ি, নাচোল এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় হয়ে আসছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তা সরবরাহ করা হচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) পাওয়ার পাম্প, অগভীর নল কূপ ও গভীর নলকূপ চালু করার পর বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান ফসলক্রম প্রধান ফসলক্রম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে খরাপ্রবণ ছয়টি উপজেলার ফসলক্রমের একটি চিত্র কৃষি প্রতিবেশের তথ্যসহ সংযুক্তি ১-৬ এ প্রদান করা হল।

৩.০ ফসল ধারার উৎপাদনশীলতার সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ

ফসল উৎপাদনশীলতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা মাটির পানির ধারণ ক্ষমতার স্বল্পতা যা শুষ্ক মৌসুমের (রবি) বৈশিষ্ট্য, যখন একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় না। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৪০-৫০ মি.মি.বৃষ্টিপাত হয় এবং আগাম খরিফ-খরিফ-১ (মার্চ-মে) মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় ১০০-২৭৫ মি. মি., এ সময় মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অতি নগণ্য। মাটিতে ধারণকৃত পানি ফসলের চারা গজানো, পর্যাপ্ত ও সুঠাম গাছ প্রতিষ্ঠা, অব্যাহত বর্ধন ও বিকাশ, উচ্চ ফলনের জন্য যুতসই শুষ্ক চাষ পদ্ধতি ফসলের জন্য অপরিহার্য। রবি ও খরিফ১ মৌসুমে মাটিতে ধারণকৃত পানি ফসল চাষের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ফলে কোন কোন উপজেলায় শতকরা প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি জমি পতিত থেকে যায়, শুধু পতিত-পতিত-রোপা আমন এক মাত্র ফসলক্রমেই সীমিত থাকে।

৩.১ মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো একটি অন্যতম প্রধান বিকল্প। মজিদ প্রমুখ (২০০৫) পতিত-পতিত-রোপা আমন ধানের পরিবর্তে ছোলা-পতিত-রোপা আমন ধান ফসলক্রমের ওপর গবেষণা চালিয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করেন।

৩.২ জৈব পদার্থের বৃদ্ধি সাধন

রোপা আমন ধানে নাইট্রোজেন সার ও আগাছা নাশক অক্সিডায়াজিনন ব্যবহার করা হয় এবং জৈনা (*Fibrystilis milicia*) আগাছা নিড়ান হয়। আগাছা নাশক দ্বারা দমনের ফলে আগাছা পচে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এটি প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য (মজিদ প্রমুখ, ২০০৫)। অনুচ্ছেদ ৩.৪ এ দ্রষ্টব্য।

৩.৩ মাটির পানি সংরক্ষণে মালচ ব্যবহার

এটি একটি কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মাটির উপরিভাগ জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্বারা আবৃত করা হয়, ফলে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যেতে পারে না। খড়, ফসল ও অন্য উদ্ভিদের আবর্জনা, কচুরিপানা বা পলিথিন মালচ পানি সংরক্ষণে সক্ষম এবং খরাপ্রবণ কৃষিতে এর বহুল প্রচলন আছে। এই মালচগুলো বৃষ্টি গড়িয়ে যাওয়া পানির গতিরোধক হিসেবেও কাজ করে, ফলে পানি মাটির গভীরে প্রবেশ করে। মালচ এককভাবে অথবা ভূমি কর্ষণের সাথে মাটির পানি বাষ্পাকারে উড়ে যাওয়া বন্ধ করে, পানির অপচয় ও ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং বিভিন্ন ফসলের ফলন বাড়ায়। কালো পলিথিন মালচ (০.০৫ মিমি পুরু মাটির উপরিভাগে) অথবা ধানের খড় ২০.৫ টন প্রতি হেক্টরে (মাটির উপরিভাগে) হ্রাসকৃত কর্ষণ (২টি চাষ মই দান সহ) খুবই কার্যকর পানি সংরক্ষণ চাষ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত, যা গম, যব, সরিষা ও ছোলা ফসলের বেলায় মাটির ধারণকৃত পানিতে উচ্চ ফলন দেয়।

৩.৪ মাটির পানি সংরক্ষণে ফসলের উপাংশ, গোবর, আবর্জনা সার, সবুজ সার ও সার ইত্যাদি ব্যবহার

উপরিবর্ণিত দ্রব্যাদির ব্যবহার মাটির ভৌত অবস্থা, জৈব পদার্থ, উর্বরা শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটায় এবং মাটির পানিধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে, ফলে ফসলের ফলনও ভালো হয়।

৩.৫ মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে রাসায়নিক পানিধারকের ব্যবহার

অনেক দেশে ইদানিংকালে রাসায়নিক দ্রব্য যথা Flobond এবং Aquasorb ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুটি দ্রব্যের পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্রব্য দুটির কার্যকারিতা অত্যন্ত আশাপ্রদ, এমনকি সেচের সংখ্যা কমিয়ে আনে এবং দ্রব্য দুটি রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভেঙে মাটির সাথে মিশে যায়। প্রবন্ধকার এ দুটি দ্রব্যের ওপর পরীক্ষণ নিরীক্ষণ চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এগুলো ব্যবহারের উপকারিতা নিরাপদে নেয়া যেতে পারে।

৩.৬ পানিসাশ্রয়ী ফসল/ খরা সহনশীল ফসলের চাষ

পানিসাশ্রয়ী/খরা সহনশীল ফসল, যথা যব, সরগম, ছোলা, মসুর, মুগ, মটর, খেসারি, গম, সরিষা, তিসি, চিনা, কাউন, জোয়ার, মাসকলাই, ধনিয়া, কুসুমফুল ইত্যাদি। এই ফসলগুলোর উৎপাদনশীলতা মাটির ধারণকৃত পানিতে মোটামুটিভাবে ভালো। এই ফসলগুলোসহ উচ্চ পানির চাহিদাসম্পন্ন আরও কতকগুলো ফসলের একটি তালিকা সারণি ১ এ প্রদত্ত হল।

৩.৭ পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল (Water harvesting techniques)

পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল বলতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কথাই বোঝানো হয়েছে। মাটির ওপর দিয়ে বা বাড়ি ঘরের ছাদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া বৃষ্টির পানি বিশেষ কোনো পাত্রে বা আধারে কিংবা ক্ষেতের জমিনে ছোট ছোট গর্ত বা জলাধার তৈরি করে জমা করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সনাতন পদ্ধতি। বাংলাদেশে এর প্রয়োগ কৌশল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের, যেমন মাটি গর্ত করে, পুকুরে, মাটির বড় পাত্রে ইত্যাদিতে পানি সংরক্ষণ করা হয়। বৃষ্টির পানি দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনর্ভরণ একটি নতুন চিন্তাভাবনা। খরাপ্রবণ এলাকায় বিশেষ করে উঁচু বরেন্দ্র ভূমির কৃষকেরা তাঁদের ফসলি জমির চারদিকে শক্ত আইল তৈরি করে পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন এবং বৃষ্টি মৌসুম শুরুর আগেই চারদিকের আইল মেরামত করেন। এটি একটি নিয়মিত কাজ। পানি সরবরাহ এবং মাটিতে ধারণকৃত পানির স্থায়িত্বকাল বাড়ানোর জন্য কোনো না কোনো কাঠামো অপরিহার্য যাতে অসময়ের খরা মোকাবেলা করা যায়। এ ব্যাপারে দেশেবিদেশে দেশীয় ও উন্নত প্রযুক্তি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। খরা মোকাবেলার জন্য রাজশাহীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বরেন্দ্র স্টেশন এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কাজে আসবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ১। খরাপ্রবণ উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চলে উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে চলমান ফসলক্রমে সম্ভাবনাময় ফসলক্রম/ প্রযুক্তি/ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা তথা উপকারিতা (ছয়টি উপজেলার সারাংশ, ২০০৭)

চলমান ফসলক্রম	বিকল্প ফসলক্রম/ফসল/প্রযুক্তি/ ব্যবস্থাপনা	যৌক্তিকতা/উপকারিতা
১। পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান ২। পতিত-পতিত-বেগুন ৩। পতিত-পতিত-টমেটো (আগাম)	· তিসি-পতিত-রোপা আমন ধান · তিসি-পতিত-বেগুন · তিসি-পতিত-টমেটো (আগাম) · ছোলা-পতিত-রোপা আমন ধান · ছোলা + তিসি-পতিত-রোপা আমন ধান	· এই অঞ্চলে কোথায়ও কোথায়ও চালু আছে · তিসি অত্যন্ত খরা সহনশীল ফসল · তিসি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় · এর উৎপাদন খরচ খুব কম · ছোলা উচ্চ মূল্য ফসল · ছোলা মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে · উৎপাদন খরচ কম · খরা সহনশীল · বৃষ্টির পানিতে বা মাটিতে ধারণকৃত পানিতে চাষ করা যায়
	· পতিত-ধৈঞ্চা/শনপাট-রোপা আমন ধান/ বেগুন /টমেটো · তিসি-ধৈঞ্চা-রোপা-আমন ধান · ফসলের উপাংশ মাটিতে মেশানো	· ধৈঞ্চা/শনপাট উৎকৃষ্ট সবুজ/জৈব পদার্থ উৎপাদনকারী ফসল · উৎপাদন খরচ খুব কম · মাটিতে জৈব পদার্থ যোগায় · মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়ায় ও মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে
	· সুষম সার ব্যবহার ঃ রাসায়নিক ও জৈব সারের সমন্বয়ে	· মাটির সুস্বাস্থ্য দান · ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
৪। বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	· বোরো ধান -ধৈঞ্চা/শনপাট-রোপা আমন ধান · সরিষা-টমেটো/ভুট্টা/চিনা বাদাম/তিসি/আলু/বেগুন/বাঁধা কপি/ফুলকপি/ পেঁয়াজ/ধৈঞ্চা/ শনপাট/রোপা আমন ধান	· জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করে · উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে · ফসলের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায়
৫। সরিষা-পতিত-রোপা আমন ধান		
৬। টমেটো-পতিত-রোপা আমন ধান		

চলমান ফসলক্রম	বিকল্প ফসলক্রম/ফসল/প্রযুক্তি/ ব্যবস্থাপনা	যৌক্তিকতা/উপকারিতা
৭। ভুট্টা-পতিত-রোপা আমন ধান		
৮। তিসি-পতিত-রোপা আমন ধান		
৯। আলু-পতিত-রোপা আমন ধান	· পতিত-ধৈঞ্চা/শনপাট অন্তর্ভুক্ত করে ফসলক্রম বিন্যস্ত করতে হবে · খড় মালচ প্রয়োগ · ফসলের উপাংশ মাটিতে মেশানো · সুষম সার ব্যবহার ঃ রাসায়নিক জৈব সার সমন্বয়ে	· জৈব পদার্থ বাড়ায় · মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটায় · ফসলের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায়
১০। বেগুন-পতিত-রোপা আমন ধান		
১১। বাঁধাকপি-পতিত-রোপা আমন ধান		
১২। ফুলকপি-পতিত-রোপা আমন ধান		
১৩। খিরা-পতিত-রোপা আমন ধান		
১৪। পেঁয়াজ-পতিত-রোপা আমন ধান		
১৫। পেঁয়াজ-পতিত-রোপা আমন ধান (সুগন্ধি)		
১৬। সবজি-পতিত-রোপা আমন ধান		
১৭। বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান		
১৮। টমেটো-আউস ধান-রোপা আমন ধান	তিন ফসলি ক্রম ঃ এমনকি একই জমিতে বছরে ধানেরই তিনটি ফসল উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এটি বিতর্কিত হলেও কৃষকদের প্রচেষ্টায় তা অনেক অঞ্চলেই চালু রয়েছে। এই অতি নিবিড় ফসলক্রমে আধুনিক জাত, সুষম সার, ফসলের উপাংশ ব্যবহার ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা, যথা সেচ, আগাছা দমন, পোকা-মাকড় দমন, রোগ দমন যথাযথভাবে করতে হয়।	· ফসলক্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি · তিনটি ধান ফসলের ক্রমে মাটির জৈব পদার্থের ওপর তেমন একটা প্রভাব পড়ে না, যদি ব্যবস্থাপনা খারাপ না হয় · মাটির উর্বরা শক্তি বজায় থাকে
১৯। বোরো ধান-ভুট্টা-রোপা আমন ধান		
২০। টমেটো-মিষ্টি কুমড়া-রোপা আমন ধান		
২১। বোরো ধান-রোপা আউস ধান-রোপা আমন ধান		
২২। পতিত-আউস ধান-টমেটো (আগাম)	· তিসি-আউস ধান-টমেটো (আগাম) · তিসি-আউস ধান-রোপা আমন	
২৩। পতিত-আউস ধান-রোপা আমন ধান	· মাসকলাই-পুঁইশাক-বেগুন মালচ প্রয়োগ	মাটির পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
২৪। পতিত-পুঁইশাক-বেগুন		

চলমান ফসলক্রম	বিকল্প ফসলক্রম/ফসল/প্রযুক্তি/ ব্যবস্থাপনা	যৌক্তিকতা/উপকারিতা
২৫। বোরো-পতিত-পতিত	পতিতে ধৈঞ্চা ফসলের চাষ (খরিফ১ ও খরিফ২)	· জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করে · জৈব জ্বালানি সরবরাহ করে · গাছের কান্ড বেড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়
২৬। পেঁয়াজ-পতিত-পতিত		
২৭। তরমুজ-পতিত-পতিত		
২৮। আলু-পতিত-পতিত		
২৯। গম-পতিত-পতিত		
৩০। মসুর-পতিত-পতিত		
৩১। সরিষা-পতিত-পতিত		
৩২। লাউ-পতিত-পতিত		
৩৩। পতিত-আউস ধান-পতিত	খড় মালচ প্রয়োগ	মাটিতে পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
৩৪। আলু-পতিত-পতিত		
৩৫। মরিচ-পাট-পতিত		

৩.৮ খরাপ্রবণ অঞ্চলের ফসলক্রমের স্থায়িত্বকাল ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়নকল্পে ফসল, ফসলক্রম ও ব্যবস্থাপনা চলমান ফসলক্রমের কাঠামোর আলোকে সম্ভাব্য বিকল্প এ ব্যাপারে একটি রূপরেখা সারণি ২ এ প্রদত্ত হল।

সারণি ২। পানি সাশ্রয়ী/খরা সহনশীল ফসল ও উচ্চ পানি চাহিদাসম্পন্ন ফসল

ক্রমিক নম্বর	ফসল	উচ্চ ফলনের জন্য পানির চাহিদা (মি.মি.)	খরায় সহনশীলতা	মাটির ধারণকৃত পানিতে ফলন
১।	ছোলা	১০০-২০০	সহনশীল	মোটামুটি ভালো
২।	মসুর			
৩।	খেসারি			
৪।	মাঠ মটর			
৫।	গো মটর			
৬।	চীনা বাদাম (রবি)			ততোটা ভালো নয়
৭।	মাস কলাই			মোটামুটি ভালো
৮।	মুগ কলাই			
৯।	ধনিয়া			
১০।	তিসি			
১১।	সরগম	১৫০-২৫০		
১২।	যব			
১৩।	চিনা			
১৪।	কাউন			
১৫।	জোয়ার			
১৬।	গম	৩০০-৪০০	খরা সহনশীল নয়	ততোটা ভালো নয়

ক্রমিক নম্বর	ফসল	উচ্চ ফলনের জন্য পানির চাহিদা (মি.মি.)	খরায় সহনশীলতা	মাটির ধারণকৃত পানিতে ফলন
১৭।	সয়াবিন	২৫০-৩০০	কিছুটা সহনশীল	মোটামুটি ভালো
১৮।	তিল (রবি)			
১৯।	সূর্যমুখী			
২০।	কুসুমফুল	১০০-২০০	সহনশীল নয়	
২১।	পেঁয়াজ	২৫০-৩৫০	কিছুটা সহনশীল	
২২।	রসুন			
২৩।	বাঁধাকপি	২৫০-৩৫০	সহনশীল নয়	
২৪।	ফুলকপি			
২৫।	শীতকালীন সবজি			
২৬।	শীতকালীন লাউ			
২৭।	মিষ্টি কুমড়া			
২৮।	খিরা, শসা			
২৯।	করলা			
৩০।	টমেটো	৩৫০-৪৫০		ভালো নয়
৩১।	বেগুন			
৩২।	পটল			
৩৩।	তরমুজ		সহনশীল	মোটামুটি ভালো
৩৪।	সরিষা	২৫০-৩৫০		ততোটা ভালো নয়
৩৫।	আলু	৩০০-৪০০	সহনশীল নয়	
৩৬।	ভুট্টা	৩৫০-৫০০		
৩৭।	মূলা	৩৫০-৪০০		শূন্য
৩৮।	পানি কচু	৬০০-১২০০		ততোটা ভালো নয়
৩৯।	মুখি কচু	৩৫০-৬০০		
৪০।	আখ	৬০০-১০০০		
৪১।	ধান	৮০০-১২০০	মোটেই সহনশীল নয়	শূন্য

৪.০ মাঠ ফসলের ফসলক্রমের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা

মাঠ ফসলের ফসলক্রমের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার তথ্য (সারণি ৩) থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেশ কিছু ফসলক্রম লাভজনক এবং টেকসই। কিন্তু সার্বিক বিবেচনা অর্থাৎ সারণির নিচের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু সংখ্যক ফসলক্রমের উৎপাদনশীলতা হিসেবে আনার মতো নয় এবং সব মিলিয়ে ফসল চাষের মাত্রা বা নিবিড়তা ১৫৬% যা জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় অনেক কম। ফসল বহুমুখিকরণের মাধ্যমে ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়াতে হবে, আর এর জন্য প্রয়োজন খরা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগের (৩.০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে ফসলক্রমের কৃষিতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন সাধন।

সারণি ৩। মাঠ ফসলের ফসলক্রম অনুযায়ী জমির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা

ফসলক্রম	উঁচু জমি	মাঝারি	মাঝারি	জমির পরিমাণ		গ্রস মার্জিন	আয় ঃ ব্যয়
	হেক্টর	উঁচু জমি	নিচু জমি	হেক্টর	%	(টাকা)	অনুপাত
পতিত-আউস ধান-রোপা আমন ধান	১৩৩	১৯৭	২৪২	৫৭২	২.৭৯	১০১	১.৫৫
বোরো ধান-আউস ধান-রোপা আমন ধান	-	-	৪৮৮	৪৮৮	২.৩৮	২৪০	১.৪৫
বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	৭৯৪	২৭২৮	৩০৫৩	৬৫৭৫	৩২.০৩	১৮৯	১.৭৮
বোরো ধান-পতিত-পতিত	২৬৫	২৩৯	৬৫১	১১৫৫	৫.৬৩	১১৯	১.৮৮
বোরো ধান-পতিত-টমেটো (আগাম)	-	১০০	-	১০০	০.৪৯	১৬৯	১.৩৮
বেগুন-পতিত-রোপা আমন ধান	১৭	-	-	১৭	০.০৮	৫৩৭	৩.২৪
পতিত-আউস ধান-রোপা আমন	৩৩	১৬৫	-	১৯৮	০.৯৭	১৫০	১.৮০
পতিত-বোরো/রোপা আউস ধান-পতিত	১১৬	১০০	৫৬৩	১০৪৩	৫০৮	৬০	১.৫০
পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	৪৮৩৭	১৩৯২	১১৮৮	৭৩৭৭	৩৫.০৪	৭০	১.৬৭
পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	-	-	৩৩	৩৩	০.১৬	৪৬৭	১.৫১
পতিত-পতিত-বেগুন	১৩২	-	-	১৩২	০.৬৪	৪৪	১.৩১
পতিত-পতিত-টমেটো	২৫	-	-	২৫	০.১২	১৩১	১.৫৪
আম	-	৩৩	৩৩	০.১৬	-	-	-
সরিষা-পতিত-রোপা আমন	-	১৩২	৩৩	১৬৫	০.৮০	৯২	১.৪২
সরিষা-পতিত-পতিত	৪০	৯৮	-	১৩৮	০.৬৭	২২	১.২২
আলু-পতিত-রোপা আমন ধান	২১৪	৮৬	-	৩০০	১.৪৬	৪৯৮	৩.৮১
আলু-পতিত-পতিত	২৫	১৪৮	১৭	১৯০	০.৯৩	৪২৮	৬.৯৪
তিসি-পতিত-রোপা আমন ধান	৬৬০	-	-	৬৬০	৩.২২	৮১	২.১৪
টমেটো-আউস ধান-রোপা আমন ধান	৬৬	-	৮	৭৪	-	-	-
টমেটো-পতিত-রোপা আমন ধান	১৪৮	৯৯	১৬	২৬৩	১.২৮	৩০৫	৫.০১
তরমুজ-পতিত-পতিত	৬৬	৬৬	-	১৩২	০.৬৪	৪.১২	৮.১০

শিম-পতিত-পতিত, বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান, বোরো ধান-আউস ধান-পতিত, বোরো ধান-ভুট্টা-রোপা আমন ধান, বেগুন-পতিত, বাঁধাকপি-রোপা আমন ধান, বাঁধাকপি-পতিত-পতিত, ফুলকপি-পতিত-রোপা আমন ধান, মরিচ-পতিত-পতিত, মরিচ-পাট-পতিত, পতিত-বোনা আউস-পতিত, টমোটো-পতিত-রোপা আমন ধান, রসুন পতিত-পতিত, লাউ-পতিত-পতিত, চিনাবাদাম-পতিত-রোপা আমন ধান, খিরা-পতিত-রোপা আমন ধান, মসুর-পতিত-পতিত, ভুট্টা-পতিত-রোপা আমন ধান (আন্তঃ ফসল), আম-, পেঁয়াজ-পতিত-রোপা আমন ধান (সুগন্ধি), পেঁয়াজ-পতিত-পতিত, আলু-পতিত, আলু-আখ-গম-পতিত-রোপা আমন ধান ও গম-পতিত-পতিত ফসলক্রমের আওতায় জমির পরিমাণ খুব কম হওয়ায় এবং তথ্যগত অসুবিধার কারণে পরিসংখ্যান দেয়া হলো না।

সার্বিক ফসল চাষের মাত্রা ঃ ১৬৫%

৫.০ বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ফসলের চাষ

পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে বাড়ির ভিটায় ফল, সবজি, কাঠ, জ্বালানি ও ওষধি গাছের চাষ হয়। পত্নীতলা উপজেলার ইসাপুরে বসত বাড়ির গড় জমির পরিমাণ ৩.৭০ ± ১.১১ শতক এবং নাচোল উপজেলার মুরাদপুরে ৯.৬৫ ± ৫.১০ শতক।

বসত বাড়ির জমির পরিমাণ ৩.৫০ শতকের নিচে হলে সেখানে ফসলের জন্য জায়গা সংকুলান হয় না। কোনো কোনো কৃষকের নিজের বসত বাড়ি নেই। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, পেপে, ডালিম, নারিকেল, লেবু, জলপাই এবং সজিনা বৃক্ষ-ফসল হিসেবে চাষ হয় যার একটি ছাড়া সবগুলোই ফল ফসল। সজিনা সবজি ফসল। বেগুন, শিম, করলা, চাল কুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, পুঁইশাক, টমেটো, রসুন ও পেঁয়াজ, সবজি ফসল। রসুন ও পেঁয়াজ মসলা হিসেবে চাষ হয়, সজিনা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। বাঁশ ও নিম কাঠ ফসল হিসেবে রোপণ করা হয়। ঐ অঞ্চলে জ্বালানির জন্য অপরিহার্য এমন কোনো দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতি নেই।

কৃষকের বসতবাড়ি সংলগ্ন ভিটায় উৎপন্ন ফসলের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার চিত্র সারণি ৪ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪। বাড়ির ভিটার জমির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা

গ্রাম		বাড়ি ভিটার জমি (শতক)	বাড়ি প্রতি মোট আয় (টাকা)	গ্রস মার্জিন (টাকা)
আইমপুকুর	গোদাগাড়ি	৭.৩১± ৪.১১	১৫১২	১২১১
রসুলপুর		৬.৬১± ৩.০১	১১০৫	১০১০
গজলবাড়ি	নাচোল	৮.৫০± ৪.২৫	২৮৫৩	২১৫১
মুরাদপুর		৯.৬৫± ৫.১০	৩১৮৬	২৫০৭
ভাটন্দা	নিয়ামতপুর	৪.৮০± ২.০১	১০১২	৯৮১
সামাবাজ		৯.৩৮± ৫.৮২	৩০১৯	২৪৮৯
ননাহর	পোরশা	৬.৭০± ৩.৯১	১২৮৯	১১৬১
কুসুম কুন্ডা		৪.৬০± ২.০৪	১২৮১	১০৭৮
খিদিরপুর আদিবাসী	সাপাহার	৩.৮৮± ১.২১	৮৫১	৭৮৭
খিদিরপুর মুসলিম		৬.৭± ৩.৬৭	১০৭২	৮৯২
আবাদিপাড়া	পত্নীতলা	৪.৩৩± ২.২২	৯৯০	৯১১
ইসাপুর		৩.৭০± ১.১১	৭৮৫	৬১৫

অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা আত্মপোষণের খামার ব্যবস্থায় উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে, এর মূল কারণ সম্ভবত এই যে, বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ পদ্ধতি একটি সাপ্লিমেন্টারি এন্টারপ্রাইজ বা সম্পূরক উদ্যোগ। পারিবারিক শ্রমের মূল্য এতে ধরা হয় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভিটা বাড়িতে ফসলচাষের জন্য কমপক্ষে বসত বাড়ির জমির পরিমাণ ৩.৫০ শতকের ওপর হওয়া প্রয়োজন। সারণিতে দেখা যায় যে, আলোচিত অঞ্চলের বসত বাড়ির জমির পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাৎ ভিটা বাড়িতে ফসল চাষ উন্নয়নের অনেক সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভিটা বাড়িতে উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা হচ্ছে না। অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা গতিময় এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে বসত বাড়ির আঙ্গিনায় কৃষির উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

৬.০ উপসংহার

ফসল, ফসলক্রম ও ফসল ধারার ফলন ও উৎপাদনশীলতা খরা দ্বারা দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে মাটিতে ধারণকৃত পানির স্বল্পতা, বৃষ্টির পানির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির অপ্রতুলতা, ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে মাটির ধারণকৃত পানি স্বল্প পরিমাণে থাকে যা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মাটি অত্যন্ত অম্ল ও কিছু অপরিহার্য পুষ্টি মৌলের স্বল্পতা বিদ্যমান। বর্ষাকালে মাটি সবসময়ই স্যাঁতসেঁতে থাকে। খরিফ১ মৌসুমে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত। অধিকাংশ জমির মালিকানা অল্প সংখ্যক (অনুপস্থিত) বিত্তশালীদের হাতে। বেশির ভাগ কৃষক স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন, স্বল্প জমির মালিক অথবা ভূমিহীন, বর্গা জমি ও শ্রম বিক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জমির মালিকের তরফ থেকে আসে। এহেন প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার মাঝে কৃষকেরা জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

উচ্চ বরেন্দ্র ভূমিতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বৃষ্টিনির্ভর ধান ভিত্তিক ফসল ধারা বছরের পর বছর চলে আসছে। সত্তরের দশক থেকে আধুনিক প্রযুক্তি যথা উন্নত জাত-সার-সেচ-বালাই নাশক-পাওয়ার টিলার (কর্ষণযন্ত্র) প্রচলন শুরু হয়।

প্রধান ফসলক্রম পতিত-পতিত-রোপা আমন (৩৫.৯৪%), বোরো ধান-পতিত-রোপা ধান (৩২.০৩%), বোরো ধান-পতিত-পতিত (৫.৬৩%) পতিত-আউস ধান-পতিত (৩.৩০%), তিসি-পতিত-রোপা আমন ধান (২.৯২), বোরো ধান-আউস ধান-রোপা আমন ধান (২.৩৮%), পতিত-আউস ধান-রোপা আমন ধান (১.৮২%), আলু-পতিত-রোপা আমন ধান (১.৪৬%), পতিত-বোনা আমন ধান-(১.২৯%), টমেটো-পতিত-রোপা আমন ধান (১.২৮%), টমেটো-পতিত-রোপা আমন ধান (১.২৮%) এবং বাকি ১৭.৩০% জমিতে ৪১টি (০.০২-০.৯৭%) ফসলক্রমে চাষাবাদ হয়। ঐ সমস্ত ফসলক্রমের ফসল হচ্ছে রোপা আমন ধান, আউস ধান, বোরো ধান, শিম, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, পাট, টমেটো, সুগন্ধি ধান, পুঁইশাক, খিরা, মসুর, ভুট্টা, পেঁয়াজ, সরিষা, আলু, আখ, মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ, গম ও শাক-সবজি। এই ফসলক্রমগুলো অবলম্বন করে থাকেন ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় কৃষকেরা।

ফসলক্রমগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মৌসুমি পতিত জমির পরিমাণ অনেক বেশি। উপজেলা পর্যায়ে যে ফসলক্রম দেখানো হয়েছে তাতে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে নিম্নমুখী ফসল চাষের মাত্রায়, নিবিড়তায় ও ফসল বহুমুখিকরণে। এই অবস্থার জন্য প্রধান কারণ ব্যবহারযোগ্য পানিসম্পদের সীমাবদ্ধতা, পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল, দক্ষতার অভাব, খরার প্রচন্ডতা আর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট।

খরার প্রচন্ডতা উত্তরণের জন্য মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, মাটির জৈব পদার্থের বৃদ্ধি সাধন, জৈব, অজৈব ও রাসায়নিক মাল্‌চ ব্যবহার, ফসল ক্ষেতে বৃষ্টির ও শিশিরের পানি জমানো ও সংরক্ষণ, পানিসাশ্রয়ী ও খরা সহনশীল ফসলজাত প্রবর্তন করে বহুমুখী ফসলক্রম ও ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়িয়ে উচ্চ উৎপাদনশীল ও টেকসই ফসল ধারা গড়ে তোলা যেতে পারে যা অনেক দেশের খরা/ শুষ্কপ্রবণ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। ফসলের জন্য বৃষ্টিসহ ও ভূপৃষ্ঠস্থ অন্যান্য পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আর তা যতো শীঘ্র হয় ততোই মঙ্গল খরাপ্রবণ অঞ্চল তথা দেশের কল্যাণে।

সংযুক্তি

ভূমি ও মৃত্তিকাসম্পদ নির্দেশিকা ঃ গোদাগাড়ি (১৯৯১), নাচোল (১৯৯৭), পোরশা ও পত্নীতলা (১৯৯৫), নিয়ামতপুর (১৯৯৮), ও সাপাহার (২০০২)।

সংযুক্তি ১

কৃষি প্রতিবেশ*, ফসল ধারা ও ভূমি ব্যবহার

গোদাগাড়ি উপজেলা

পানিসম্পদ

ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস নদী, খাল, বিল ও পুকুর। উপজেলার দক্ষিণ সীমানা দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত। উপজেলার ৩৮২০টি পুকুর মধ্যে ৯৮৬টি হাজামজা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২০-৩০ মিটার নিচে, পানি সেচের উপযোগী। পানি উত্তোলন ব্যয়বহুল এবং ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ সীমিত। সেচের আওতায় জমির পরিমাণ ৫৭২০ হেক্টর। গভীর, অগভীর ও শক্তি চালিত পাম্পে সেচ প্রদান করা হয়।

বৃষ্টিপাত

মৌসুম	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)	৪৫
আগাম খরিফ/খরিফ১ (মার্চ-মে)	২০২
খরিফ২ (জুন-অক্টোবর)	১১৯১
মোট	১৪৩৮

ভূমি ব্যবহার ও ফসল ধারা

ভূমির ধরন	ভূমি ব্যবহার/ফসল ধারা	জমির পরিমাণ		ফসল চাষের নিবিড়তা (%) (Cropping Intensity)	
		হেক্টর	%	ফসল ক্রমানুসারে	সার্বিক
উঁচু ভূমি	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	২৬,৩২৬	৪১.৯২	১০০	১১৮
	টমেটো-বোনা আউস-পতিত	৪৬৩	১.৩১	২০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	১,৩১৮	৩.৭৪	২০০	
	পতিত-বোনা আউস-রোপা আমন ধান	৪,২৫৫	১২.০৭	২০০	
	টমেটো-রোপা আমন ধান	২,৫৯২	৯.৩৫	২০০	
মাঝারি উঁচু ভূমি	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	২৮৮	০.৮২	২০০	

সংযুক্তি ২

কৃষি প্রতিবেশ, ফসল ধারা ও ভূমি ব্যবহার

উপজেলা নাচোল

পানিসম্পদ

বৃষ্টিপাত

মৌসুম	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)	৫০
আগাম খরিফ খরিফ১ (মার্চ-মে)	২২৯
খরিফ২ (জুন-অক্টোবর)	১,২৬৬
মোট	১,৫৪৫

ভূমি ব্যবহার ও ফসল ধারা

বসত বাড়ি প্রায় ৩%। এক ফসলি জমি ৫৮% এর মত রোপা আমনের চাষ হয়, বাকি ৪২% ফসলি জমি রবি ও খরিফ২ মৌসুমে ফসলের চাষ হয়।

ভূমির ধরন	ভূমি ব্যবহার/ফসল ধারা	জমির পরিমাণ		ফসল চাষের নিবিড়তা (%)	
		হেক্টর	%	ফসল	সার্বিক
উঁচু ভূমি	বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ	৪৮৮	২.২৫		১২৭.৩০
	পতিত-বোনা/রোপা আউস-রোপা আমন ধান	২০৮	০.৯৫	২০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	১,৬১১	৭.৪৩	২০০	
	রবি ফসল- খরিফ সবজি	৪৮৮	২.২৫	২০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	৩,০৬৪	১৪.১২	২০০	
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	১২,৩৫৯	৫৬.৯৬	১০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	১,১১১	৫.২৬	২০০	
মাঝারি উঁচু ভূমি	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	২০৭	০.৯৫	১০০	

সংযুক্তি ৩

উপজেলা নিয়ামতপুর

পানিসম্পদ

এই উপজেলার পানিসম্পদের প্রধান উৎস খাল, পুকুর, বিল, খাড়ি, ডোবা। এই উপজেলায় কোন নদী নেই। বাইদের ভেতরে বেশ কিছু সংখ্যক খাল রয়েছে।

পানি সারা বছর থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে পানির গভীরতা কমে যায়। পুকুরের সংখ্যা ১,৪৪১। প্রায় সব পুকুরই বাড়ি সংলগ্ন এবং বাজারের কাছে। পুকুরগুলো গৃহস্থালি কাজে এবং মাছ চাষে ব্যবহার করা হয়। হাজামজা পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৯০৩।

বৃষ্টিপাত

মৌসুম	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)	৪৬
আগাম খরিফ খরিফ১ (মার্চ-মে)	২৩২
খরিফ২ (জুন-অক্টোবর)	৯৭৬
মোট	১,২৫৪

ভূমি ব্যবহার ও ফসল ধারা

ভূমির ধরন	ভূমি ব্যবহার/ফসল ধারা	জমির পরিমাণ		ফসল চাষের নিবিড়তা (%)	
		হেক্টর	%	ফসল অনুযায়ী	সার্বিক
উঁচু ভূমি	বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ	১৩৬৯	৬.২৬		১১৩
	বর্ষব্যাপি ফসল (আদা/হলুদ/আখ)	১১৯	০.৯৪	৩০০	
	রবি ফসল-রোপা আউস ধান-রোপা আমন ধান	১৫৬	২.০৯	৩০০	
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	১৭,৩০০	৭৯.১০	১০০	
	রবি সবজি-পতিত-রোপা আমন ধান	১১৮	৩.০৫	২০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	২৩৭	১.০৮	২০০	
	পতিত-রোপা আউস-রোপা আমন ধান	২০৮	০.৯৫	৩০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	১৭০	০.৭৭	৩০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	১,৩৭৭	০.৩০	-	
	বহু বর্ষব্যাপি ফসল (আম,কাঁঠাল, বন প্রজাতি)	১৭০	০.৭৭	-	

সংযুক্তি ৪

পোরশা উপজেলা

পানিসম্পদ

ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রধান উৎস নদী, খাল ও পুকুর। উপজেলার পশ্চিমাংশ দিয়ে পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে নদীর পানি সেচে ব্যবহার হয়। প্রায় ২,১১৫টি পুকুর আছে, এর মধ্যে ৫৪৩টি হাজামজা। পুকুরগুলো মাছ চাষ ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার হয়। এই উপজেলায় বেশ কিছু সংখ্যক হাজামজা খাল-বিল রয়েছে, যা নদীর সাথে সংযুক্ত। জানা গেছে যে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পলি গঠিত সমভূমিতে ৫-৭ মিটার নিচে এবং উঁচু বরেন্দ্র ভূমিতে তা ২০-৩০ মিটার নিচে। পানির মান ভালো এবং সেচের উপযোগী।

বৃষ্টিপাত

মৌসুম	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)	৪০
আগাম খরিফ খরিফ১ (মার্চ-মে)	১৫৯
খরিফ২ (জুন-অক্টোবর)	১,১২৬
মোট	১,৩২৫

ভূমি ব্যবহার ও ফসল ধারা

বসত বাড়ি প্রায় ৩%। এক ফসলি জমির ৫৮% এর মতো জমিতে রোপা আমনের চাষ হয়। বাকি ৪২% ফসলি জমি রবি ও খরিফ২ মৌসুমে ফসলের চাষ হয়।

ভূমির ধরন	ভূমি ব্যবহার/ফসল ধারা	জমির পরিমাণ		ফসল চাষের নিবিড়তা (%)	
		হেক্টর	%	ফসল ক্রমানুসারে	সার্বিক
উঁচু ভূমি	বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ	২৭৫	-		১২২.৯৭
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	১৩,৮৭৫	৭৪.৭৫	১০০	
	পতিত-বোনা আউস-রোপা আমন ধান	১,৫৬৩	৮.৪২	২০০	
	গম/বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	১,০১৮	৫.৪৯	২০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	১,৩৫৮	৭.৩২	২০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	২৭৫	১.৪৮	২০০	
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	৩৫৪	১.৩০	১০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	৪৭	০.২৫	২০০	
	বোরো ধান-পতিত-পতিত	৪৭	০.২৫	১০০	
মাঝারি উঁচু ভূমি	পতিত-রোপা আউস-পতিত	২৮	০.১৩	১০০	

খরিফ২ এ ৭০% জমিতে রোপা আমন এবং রবিতে ১০% জমিতে গমের চাষ হয়। বোনা আউসের পরে রোপা আমন ধানের চাষ হয় ১০% জমিতে। বসত বাড়িতে আমের বাগান আছে।

সংযুক্তি ৫

সাপাহার উপজেলা

পানিসম্পদ

ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রধান উৎস নদী, খাল এবং পুকুর। উপজেলার পশ্চিম অংশ দিয়ে পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত। শুষ্ক মৌসুমে এতে নৌ চলাচল করতে পারে না। ছোট বড় মিলে ২,৪৭৯টি পুকুর রয়েছে, যার মধ্যে ১,১৫৬টি পুকুরে চাষ হয়। কিছু কিছু পুকুর খোলা মাঠের মাঝে রয়েছে। এই উপজেলায় ১০,৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা আছে।

বৃষ্টিপাত

মৌসুম	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)	৪৬
আগাম খরিফ খরিফ১ (মার্চ-মে)	২৩২
খরিফ২ (জুন-অক্টোবর)	১,২৭৬
মোট	১,৫৫৪

ভূমি ব্যবহার ও ফসল ধারা

ভূমির ধরন	ভূমি ব্যবহার/ফসল ধারা	জমির পরিমাণ		ফসল চাষের নিবিড়তা (%)	
		হেক্টর	%	ফসল ক্রমানুসারে	সার্বিক
উঁচু ভূমি	বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ	১,৪৮৯	৪.৫৯	-	১২২.৯৭
	রবি ফসল-বোরো ধান-রোপা আমন ধান	১,৯১৩	৪.৯১	৩০০	
	বোরো ধান-রোপা আউস-রোপা আমন	১,৯১৩	৫.৯১	৩০০	
	বোরো ধান-পতিত-রোপা আমন ধান	১,৬৩০	২০.৪৩	২০০	
	রবি ফসল-পতিত-রোপা আমন ধান	৪,৮০৩	১৪.৮০	২০০	
	রবির আন্তঃফসল+আখ	৮৬৯	২.৬৮	৩০০	
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	১৩,৬০৩	৪১.৯২	১০০	
	রবি ফসল-পতিত-পতিত	১১৪	০.৩৫	১০০	
	পতিত-রোপা আউস-রোপা আমন ধান	২২৬	০.৭০	২০০	
মাঝারি উঁচু ভূমি	বোরো ধান-পতিত-পতিত	৬৭৭	২.০৮	১০০	
	পতিত-পতিত-রোপা আমন ধান	১২৭			
	বোরো ধান-পতিত-পতিত	২১	০.০৬	১০০	
মাঝারি নিচু ভূমি	বোরো ধান-পতিত-পতিত	৪২	০.১২	১০০	

এই স্থানান্তরিত জনসংখ্যার সিংহভাগই নতুন স্থানে বিভিন্ন মানসিক এবং পরিবেশগত দুর্ভোগের শিকার হয়। জনসংখ্যার এই স্থানান্তরের ফলে পরিবারের মহিলা সদস্যরা খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। তারা সঠিক ভাবে কাজ করতে না পারায় তাদের ছেলেমেয়েদের যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে একদিকে শিক্ষিতের হার কমে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। IPCC এর জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৫০ সালের মধ্যে ৮০ লক্ষ লোক খরায় আক্রান্ত হবে। FAO ২০০৭ এর তথ্যানুসারে দুটি কারণে খরা হয়, যথা- জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূপৃষ্ঠে পানির ঘাটতি।

শহর ও গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর খরা বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন দেশটিকে আরও খরাপ্রবণ করে তুলছে (শহীদ এবং বেরাউন, ২০০৮)। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার প্রবণতা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বিশেষত শীতকালীন ফসলের ওপর। খরার কারণে ভূমি অবক্ষয় হচ্ছে পশু-পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছে এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা প্রকট হচ্ছে (চৌধুরী, ২০১০)। খরাপ্রবণ (বিশেষত উত্তরবঙ্গের) এলাকায় লোকজনেরা টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। এসব কৌশলের মধ্যে জনসংখ্যা স্থানান্তর অন্যতম। তারা স্থানান্তরিত হচ্ছে নিকটবর্তী অথবা কোন দূরবর্তী শহরে যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষার ওপরে প্রভাব

একটি সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। বরেন্দ্র অঞ্চলের শিক্ষার প্রসার বরাবরই অবহেলিত রয়ে গেছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে। ফলস্বরূপ, তাদের পরবর্তী প্রজন্মও বংশ পরম্পরায় একই পথে হাঁটছে, যদিও সাম্প্রতিক সময়ের চিত্র কিছুটা ব্যতিক্রম। শিক্ষার প্রভাব এবং একই সাথে বিভিন্ন কুসংস্কার এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারাকে রেখেছে অনেকটাই আধুনিকতার আড়ালে। খরাপ্রবণ অঞ্চলের এই বিশাল মানব সম্প্রদায় যেখানে দিন আনা দিন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত শিক্ষা তাদের কাছে এখনও একটি দুর্লভ বস্তু হিসেবেই রয়ে গেছে। শিক্ষার অভাবে এ অঞ্চলে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক প্রথা, অকালে গর্ভধারণ, মা ও শিশুর অপুষ্টি, মারামারি, ঝাগড়া-বিবাদ, খুন-খারাবি হচ্ছে। শিক্ষার হারও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ মহিলাই শিক্ষার আলোর বাইরে থাকে। আমরা জানি শিক্ষিত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষিত মা। যেহেতু মায়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তাই এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার অনেক কম ঘটেছে।

প্রতিকার

তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ভূমির অবক্ষয় রোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

২. জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা।

৩. সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

৪. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাড়ানো।

৫. পরিমাণমত ভূগর্ভস্থ পানি সেচের জন্য জমিতে দেওয়া।

৬. কার্বন নিঃসরণ প্রতিকার যন্ত্র স্থাপন করা।

৭. রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা।

৮. পোকামাকড় দমনে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৯. ফসলি জমির আশেপাশে ইটের ভাটা, কলকারখানা স্থাপন না করা।

১০. পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

১১. জমিতে একই ফসল বারবার চাষ না করে পর্যায়ক্রমিক ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

১২. বনভূমি ধ্বংস রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩. জমির ক্ষয় রোধে যে সকল ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলো চাষ করা যেমন- আলু, মসুর ডাল ও রবি শস্য।

১৪. দূষণ প্রতিরোধ জাতের উদ্ভাবন করা যাতে মাটির উর্বরতা বজায় থাকে।

১৫. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ফসল রোপণ করা যেমন- ধইঞ্চা, খেসারি কলাই।

১৬. ফসলের অবশিষ্ট অংশ জমিতে রেখে চাষ দেওয়া।

১৭. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি জোরদার করা।

১৮. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো।

১৯. কম সেচ লাগে এই জাতীয় ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা এবং খাদ্যাভাস গড়ে তোলা।

২০. উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

২১. খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় বিয়ষক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করা।

উপসংহার

ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমির অবক্ষয়, উর্বরতা শক্তি হ্রাস, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই খরার প্রকোপ বেড়ে চলছে যা উত্তরাঞ্চল তথা বরেন্দ্র অঞ্চলকে মরুকরণের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে অনেক বেশি হারে দেখা যায়। যার ফলশ্রুতিতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, অনাবৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরের জরিপমতে দেখা গেছে বৃষ্টিপাতের অভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে কমে যাচ্ছে- যা ঐ এলাকার খাদ্য উৎপাদন কৌশলকে ধ্বংস করা ছাড়াও খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্য মজুদ ও কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন কৌশলকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা যাচ্ছে, লোকজন বেকার হয়ে পড়ছে যা জনসংখ্যা স্থানান্তরে ধনাত্মক প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও অনাবৃষ্টি এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ এবং প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ লোক বাড়ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২২ বছরে প্রায় ২.৪ কোটি জনসংখ্যা বাড়বে। বলা যায় যে, দেশের মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ এই অঞ্চল থেকে আসে। সুতরাং এই অতিরিক্ত লোকের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করার জন্য অতি দ্রুত কীভাবে খরার প্রকটতা কমানো যায় সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

Ahmed, A. U. (2006). Bangladesh: Climate Change Impacts and Vulnerability, a Synthesis; Climate Change Cell, Department Of Environment, Comprehensive Disaster Management Program, Government of the People's Republic of Bangladesh

Anik, S. I.; Kabir, M. H. and S. Ray. Climate Change and Food Security. Unnayan Onneshan, House: 16/2, Indira Road, Farmgate, Dhaka-1205, Bangladesh. Web: www.unnayan.org

Bangladesh Ministry of Agriculture (MoA), (2012). Available at http://www.moa.gov.bd/statistics/bag.htm

Dey, N. C., M. S. Alam, A. K. Sajjan, M A. Bhuiyan, L. Ghose, Y. Ibaraki and F. Karim (2011). Assessing Environmental and Health Impact of Drought in the Northwest Bangladesh. J. Environ. Sci. & Natural Resources, 4(2): 89-97, 2011.

Dregne, H.E. (2002). Land Degradation in the Drylands. Arid Land Research and Management,

Drought. Banglapedia. http//www.banglapedia.org/httpdocs/HT/D0284.htm

Ericksen, N.J.; Q.K. Ahmad and A. R. Chowdhury (1997). Socio-Economic Implications of Climate Change for Bangladesh. Briefing Document No. 4, Published by Bangladesh Unnayan Parishad (BUP), House #41 Ka, Road # 4A, Dhanmondi R. A., P. 0. Box-5007 (New Market), Dhaka-1205, Bangladesh

FAO (2007). Climate Variability and Change: Adaptation to Drought in Bangladesh.

Huq, S. and J. Ayers (2008). Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh. International Institute for Environment and Development, Endsleigh Street, WC1H, 0DD, London, United Kingdom.

IFPRI Discussion Paper (2011). The Economics of Desertification, Land Degradation, and Drought Toward an Integrated Global Assessment, Environment Production and Technology Division, INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE, the Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany

Low, P.S. (ed) (2013). Economic and Social impacts of desertification, land degradation and drought. White Paper I. UNCCD 2nd Scientific Conference, prepared with the contributions of an international group of scientists. Available from: http://2sc.unccd.int (accessed 26 March 2013.)

Rajesh Sikder, R. and J. Xiaoying, J. (2014). Climate Change Impact and Agriculture of Bangladesh. Journal of Environment and Earth Science, Vol.4, No.1, 2014.

Rajib Shaw, Huy Nguyen, Umma Habiba, Yukiko Takeuchi, (2011),"Chapter 1 Overview and Characteristics of Asian Monsoon Drought". Community, Environment and Disaster Risk Management, Vol. 8 pp. 1-24

Ramamasy, S. and S. Baas (2007). Climate variability and change: adaptation to drought in Bangladesh: Case Study. Institutions for Rural Development, Asian Disaster Preparedness Center, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Umma Habiba, Rajib Shaw, (2013),"Drought Scenario in Bangladesh". Community, Environment and Disaster Risk Management, Vol. 13 pp. 213-245
http:// dx.doi.org/10.1108/S2040-7262(2013)0000013016

Umma Habiba, Rajib Shaw, Yukiko Takeuchi. "Chapter 2. Socioeconomic Impact of Droughts in Bangladesh". In: Droughts in Asian Monsoon Region. Published online: 2011; 25-48. Permanent link to this document: http:// dx.doi.org/10.1108/S2040-7262(2011)0000008008, Downloaded on: 10 November 2014, At: 02:04 (PT)

Umma Habiba, Yukiko Takeuchi, Rajib Shaw, (2010),"Chapter 3 Overview of drought risk reduction approaches in Bangladesh". Community, Environment and Disaster Risk Management, Vol. 5 pp. 37-58

UNCCD (2005). Climate and Land Degradation. World Meteorological Organization (WMO), ISBN 92-63-10989-3, 7bis, avenue de la Paix - P.O. Box 2300 - CH 1211 Geneva 2 - Switzerland P.O. Box 2300 - CH 1211 Geneva 2 – Switzerland.

UNDP (2009). Policy study on the probable impact on climate change on poverty and economic growth and the options of coping with adverse effect of climate change in Bangladesh. Support to monitoring PRS and MDGs in Bangladesh. General Economic Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh and UNDP Bangladesh.

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ভূমি অবক্ষয়ের প্রভাব মোকাবেলা

(Livestock Development in Bangladesh: Combating the Impacts of High Temperature and Land Degradation)

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম [১]

Summary

Bangladesh is a developing country where about 70% people live in the rural areas and around 40% of them are lying below poverty line (MoEF, 2099). Most of the rural people depend mainly on agriculture, which includes crop, livestock and fisheries. In Bangladesh, livestock is the second largest sector after fisheries to meet the national protein demand (BARC, 2011). However, it is unfortunate that the livestock is under threat due to drastic climate change. Recent studies show that global temperature increased from 1^0 to 1.5^0 Celsius during the last 30-50 years and it is predicted that the average global temperature my rise up to 4^0 Celsius by the end of this century (IFAD, 2010). There are many reasons for the increase of temperature. Soil erosion, deforestation, heavy emission of CO_2 or green house gas, industrialization, urbanization, population pressure, burning of fossil fuel etc are responsible for global warming.

Climate change is expressed in the form of repeated cyclones, rising sea level, flood, drought, deforestation, rising temperature, low precipitation and other environmental hazards, leaving a negative impact on the overall process of our national development. Livestock also suffers severely due to climate change that results in high temperature, seasonal variability, disease incidence, low availability of fodders, low soil fertility, excessive soil erosion all having direct bearings on livestock production. Keeping this in view, the Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI) has taken a number of short, mid and long term programs/ projects/ policy actions in line with the vision 2021 to attain the research and development goals in livestock and poultry and to mitigate the effects of climate change. BLRI recently developed a good number of breeds and varieties along with a series of improved management technologies, which include a commercial layer chicken strain, development of dairy and cattle breed, saline tolerant fodder varieties, feeding system for sheep and buffalos in delta areas, fodder production model and preservation technique, deworming model and so on. It is suggested to further strengthen the research capability of BLRI for continuous development and transfer of environment and zone-friendly poultry and livestock technologies to cope with the changing climate and related stresses.

[১] মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১

জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন

কোনো জায়গার বেশ কিছুদিনের গড় আবহাওয়াকে সেখানকার জলবায়ু বলা হয়। যে সব নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে কোনো জায়গার জলবায়ু নির্ধারণ করা হয় সেগুলো হলো বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা। আবহাওয়া আকস্মিক ও লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। বিগত ১৫০-২০০ বছরে জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের জন্য মানুষই বহুলাংশে দায়ী। আবহাওয়া মন্ডলের কিছু কিছু গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড পৃথিবী ঘিরে একটা আচ্ছাদন তৈরি করে। জাঁ-ব্যাপটিস্ট নামে একজন ফরাসি বিজ্ঞানী এই আচ্ছাদনকে সর্বপ্রথম গ্রিনহাউস ইফেক্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন। গ্রিনহাউস গ্যাসের ব্যাপকতা মূলত ক্রমবর্ধমান কৃষিকাজ, ভূমির ব্যবহার এবং অন্যান্য উৎস থেকে উৎপন্ন মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মাত্রা, শিল্পবর্জ্য এবং মোটরযান ও কল-কারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, সিএফসি (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন) গ্যাস ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর পরিণামে যে গ্রিনহাউস ইফেক্ট সৃষ্ট হয় তা বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন বা জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায় যা মানবজাতির প্রতি একটি আসন্ন বিপদের বার্তা বহন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আজ অবধি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৩-০.৬° সে. পর্যন্ত বেড়েছে। তাপমাত্রার এই চরমভাবাপন্ন পরিস্থিতি ছাড়াও ভারি বর্ষণ, বন্যা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ক্ষতিসাধন করছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশ উত্তর মেরুতে অবস্থিত যা বরফে আচ্ছাদিত। গ্রিনহাউস ইফেক্টের ফলে বরফের আচ্ছাদন ধীরে ধীরে গলে গিয়ে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে নিম্নভূমি প্লাবিত হবে। ফলে কৃষি জমি লবণাক্ত পানির নিচে তলিয়ে যাবে ও একসময় সে অঞ্চলের প্রাণি এবং কৃষিসম্পদ হুমকির মুখে পড়বে। যার বিরূপ প্রভাব উপকূলীয় অঞ্চলে আইলা-সিডরের মতো প্রাণঘাতী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। জলবায়ুর এই বিরূপ প্রভাবে ভয়ংকর ক্ষতির তালিকার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০০০ সালের তুলনায় আগামী ২০৫০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার উৎপাদন ১৭ শতাংশ কমে যাবে। এক কথায় জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, শস্যসম্পদ, প্রাণি ও মানব সম্পদ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব পড়বে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়া সিডর, আইলা, নার্গিস, মহাসেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উল্লেখযোগ্য ক্ষতির স্বাক্ষর রেখেছে। গবেষকদের মতে, গত চার দশকে শিল্পোন্নত দেশগুলো পৃথিবীকে সর্বাধিক উষ্ণায়নের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জলবায়ুর এ পরিবর্তন বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রাণিসম্পদকে কেবলই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশটি এমনভাবে নানাবিধ প্রাকৃতিক সমস্যায় জর্জরিত যে, সেসব সমস্যা সমাধানে এখনই অধিকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কাজেই সরকারের পাশাপাশি নীরবতা ভেঙ্গে যে যার অবস্থান থেকে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করা প্রয়োজন।

প্রাণিসম্পদ এবং এর গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দৈনিক কমপক্ষে ৫০-৬০ গ্রাম প্রাণিজ আমিষ প্রয়োজন যা মূলত গবাদিপশু থেকে পাওয়া যেতে পারে। চাহিদার বিপরীতে সেখানে আমাদের দেশে প্রতি দিন গড়ে ১২-১৫ গ্রাম উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণিজ আমিষের চাহিদার মাত্র ২৫ শতাংশ পূরণ হচ্ছে ৭৫ শতাংশ ঘাটতিতে রেখে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০১১-১২ অর্থ বছরে জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অবদান ২.৫১ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৭.১৫ শতাংশ এবং একই সময়ে প্রাণিসম্পদ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৫৪ শতাংশ। দেশে বর্তমানে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ১১ হাজার ও ২৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৬৪ হাজার। দেশের শতকরা ২০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ এবং ৫০ ভাগ লোক পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২-১৩)। দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পশু-পাখি পালনের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক কথায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাণিসম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন

জীব মাত্রই পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাণি খাদ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণি উৎপাদন এবং প্রাণিসম্পদের বিকাশ জলবায়ুর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুণ সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে। উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াল গ্রাস যেমন ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ২০০৭ সালের শক্তিশালী সিডর এবং ২০০৯ সালের আইলা সেই ধ্বংসেরই স্মৃতি বহন করে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাণিসম্পদ তথা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভেড়া ও মহিষ পালিত হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা অব্যাহত হারে বাড়তে থাকলে গোচারণ ভূমি হ্রাস পাবে, ফলস্বরূপ খাদ্যাভাব দেখা দিবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো ঃ

১৯৯৮ সালের বন্যা

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে স্মরণকালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে অধিকাংশ জেলা বন্যায় প্লাবিত হয় এবং মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। নিম্নে প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

সারণি ১। ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

ক্রমিক নং	মৃত গবাদিপশু ও পাখি	সংখ্যা	অর্থনৈতিক ক্ষতি (মিলিয়ন টাকা)
১.	ক. গরু ও মহিষ	৫৩২৬	৩৩.১৩
	খ. ছাগল ও ভেড়া	৯২৯৭	
২.	**গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরোক্ষ ক্ষতি**		২৫৮১.৩৫
	ক. গরু ও মহিষ	৭৭০৬২৩৮	
	খ. ছাগল ও ভেড়া	৪১৮৩১৯৫	
	গ. হাঁস ও মুরগি	৩৫১৫৭৫৮৪	
৩.	**বাসস্থানের ক্ষয়ক্ষতি**		২০২৪৬.৪৭
	ক. গরু ও মহিষ	৭৮২৪৪৫	
	খ. ছাগল ও ভেড়া	২৭৮৮৭৯	
	গ. হাঁস ও মুরগি	১১৭৩৬৭৩	

Source: Options for Flood Risk and Damage Reduction in Bangladesh, 1998.

সিডর ২০০৭

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিক্রমায় ১৫ নভেম্বর, ২০০৭-এ এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত উপকূলবর্তী ১৭টি জেলায় আঘাত হানে। ইতিহাসের পাতায় এটি 'সিডর ' নামে পরিচিত। হাজারো লোকের মৃত্যুসহ ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাণিসম্পদ খাত। উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ৩৭,৩৯১টি গরু, ৭,২১১টি মহিষ মারা যায়। ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ছক আকারে দেয়া হলো। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণিসম্পদের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ২। সিডর ২০০৭-এ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

প্রাণির নাম	মৃতের সংখ্যা (টি)
গরু	৩৭,৩৯১
মহিষ	৭,২১১
ছাগল	৫৯,৮০৪
ভেড়া	৩৫১৭
মুরগি	২২,১৯,৩২৮
হাঁস	৩,৫৩,৬৯১

Source: Department of Livestock Services, Dhaka, 2013.

লাইভস্টক-ইকোনোমিক জোনের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব

সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানত চারটি লাইভস্টক-ইকোনোমিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অঞ্চলগুলো হলো বরেন্দ্র অঞ্চল, যমুনা নদী সংলগ্ন অঞ্চল, ডেল্টা অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চল। প্রতিটি অঞ্চলই ভূমির ধরন ও জলবায়ুগত বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যময়। যেমন বরেন্দ্র অঞ্চল চরমভাবাপন্ন, যমুনা অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ, ডেল্টা অঞ্চল দুর্যোগপ্রবণ, অপরদিকে হাওর অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পরিবেশের এই তারতম্যের জন্য জীববৈচিত্র্যও ভিন্ন প্রকৃতির। বরেন্দ্র অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ৩৫-৪২° সে. এবং শীতকালে ৪-৭° সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৬ সে.মি.। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুণ বরেন্দ্র এলাকা মরুময়তার দিকে ধাবিত হওয়ায় এ অঞ্চলে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া অপরিমিত বৃষ্টিপাত পানযোগ্য পানির সংকটকে আরো ঘনীভূত করছে। যমুনা বেসিন অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টিপাত (বার্ষিক ১৯২.৫ সে.মি.) ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবাদিপশু ও পোল্ট্রি শিল্প গড়ে উঠেছে। তবে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য এ অঞ্চলে পরজীবীর আক্রমণসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ডেল্টা অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ১৫২.৫ সে.মি. এবং তাপমাত্রা ২৬-৩১° সে.। এ অঞ্চলে সাধারণত ভেড়া ও মহিষের আধিক্য দেখা যায়। তবে সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চল প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রাণিসম্পদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর প্রকোপমাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলে হাওর এলাকা অবস্থিত যা ভাটি অঞ্চল নামেও পরিচিত। প্রতিবছর এ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয় এবং প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৬-৩১° সে. এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০০ সে.মি.। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে ও খাদ্য গ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে দিন দিন চারণভূমির পরিমাণ কমে আসছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। লবণাক্ততার দরুন মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে ফসল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। এই অধিক উষ্ণতা ও শুষ্কতার জন্য আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ ফসল উৎপাদন ১০%-২০% হ্রাস পাবে (Jones and Thornton, 2003; Thornton *et al.*, 2007)। গবেষণায় দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা ৪° সে. বৃদ্ধি পেলে বার্ষিক ধান উৎপাদন ১৭% এবং গম উৎপাদন ৬১% হ্রাস পাবে। এর ফলে মোট ৫৫৫৯ মে.টন ধানের খড় ও ৯৫.৩ মে.টন গমের খড় উৎপাদন হ্রাস পাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ঘাসের তন্তুগুলো অধিক শক্ত হয় যা প্রাণিদেহের স্বাভাবিক পরিপাক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এছাড়া, প্রাণিখাদ্য সংরক্ষণ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ১°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য গ্রহণ ১.৭২% হারে হ্রাস পেতে পারে এবং এই হার পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ৩°C উপরে গেলে আরও বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক ও প্রাণিখাদ্যের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সারণি ৩। জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক ও প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক	প্রভাবসমূহ/ঝুঁকিপূর্ণ দিক
সমুদ্র পৃষ্ঠের স্ফীতি (Sea level rise)	· চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাবে · শস্য উপজাত এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প উপজাত কমে যাবে · বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানযোগ্য পানি ও চাষাবাদে পানি সংকট হবে
লবণাক্ততা বৃদ্ধি (Salinity intrusion)	· গবাদি প্রাণির চারণভূমি কমে যাবে · সেচের উপযোগী পানি সংকট দেখা দেবে · জমির উর্বরতা কমে যাবে · সবুজ বনায়নের সংকট হবে

জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক	প্রভাবসমূহ/ঝুঁকিপূর্ণ দিক
সাইক্লোন/ জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি (Cyclone/Storm Surge)	· প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির সংখ্যা কমে যাবে/ ক্ষতিগ্রস্ত হবে · খামার পর্যায়ে স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে
জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন সমস্যা (Water Logging & Drainage Congestion)	· প্রাণিচারণ ভূমির সংকট হবে · রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে · প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বেকারত্ব হার বৃদ্ধি পাবে · গবাদি প্রাণির ঘাসজাতীয় খাদ্য উপাদানের সংকট দেখা দেবে

শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের ওপর প্রভাব

প্রাণিসম্পদের স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট আরামদায়ক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, যাকে থার্মোনি-উট্রাল জোন বলা হয়। প্রাণিকুলের জন্য তাপমাত্রার আরামদায়ক সীমা হচ্ছে ১০-২০° সে.। প্রাণিকুল উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, একে বলা হয় তাপমাত্রার ক্রিটিক্যাল সীমা। তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতি পোল্ট্রি অধিক সংবেদনশীল। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৩০° সে অধিক তাপমাত্রায় ব্রয়লার মুরগির খাদ্যগ্রহণ ৫০% পর্যন্ত কমে যায় এবং ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন ও অ্যামাইলেজের নিঃসরণ হ্রাস পাওয়ায় পুষ্টি পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। অধিক গরমে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পদন বেড়ে যায়, লালা এবং মূত্রের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়ন শরীর হতে বের হওয়ায় রক্তের আয়ন সমতা বিঘ্নিত হয়। রক্তে ইমিউনোগ্লোবিউলিনের মাত্রা কমে যায়। ফলে প্রাণির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। পোল্ট্রির ক্ষেত্রে প্যান্টিং ও হিট স্ট্রোক হতে পারে এবং মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, কিটোসিস রোগ দেখা দেয়, হৃদস্পন্দন কমে যায় এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন এবং পুষ্টিমানের ওপর অধিক তাপমাত্রার প্রভাব

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, তাপমাত্রাজনিত পীড়নের কারণে দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন প্রতিদিন গড়ে ৮-১০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে। অধিক তাপমাত্রায় গবাদিপশু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ না করে অধিক হারে পানি পান করে, ফলে রুমেন অভ্যন্তরে ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিড ও গাজন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে এবং রুমেনস্থিত উপকারী অণুজীবের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। রুমেনে উৎপন্ন ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিডের একটি অংশ অ্যাসিটিক এসিড রূপে রক্তে সঞ্চালিত হয় যা চর্বি সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় এবং প্রোপানোয়িক এসিড যা রুমেনের p^H কমিয়ে দেয় ও দুধের প্রোটিন সংশ্লেষণে বিঘ্ন ঘটায় (Bandaranayaka & Holmes, 1976)। ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন, ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদন, দুধেলো গাভীর দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়, দুধে চর্বির পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম হয়। ডিমের অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। অধিক হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণের ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ডিমের খোসা পাতলা হয়, সেই সাথে ডিমের ওজন ও উৎপাদন দুটোই হ্রাস পায়।

প্রাণিস্বাস্থ্যের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সৃষ্ট খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ পশু-পাখির দেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করে। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পরজীবীর বংশবৃদ্ধি দ্রুততর হয়। থারমাল স্ট্রেস-এর কারণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার Juan Lubroth, Animal Health Services-এর এক বিশেষ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন জীবাণুর উৎপত্তি ঘটতে পারে, নতুন নতুন রোগের উদ্ভব ঘটতে পারে, নতুন হোস্টের সন্ধানে জীবাণু বাহক মাধ্যমে নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে, প্যাথোজেন- হোস্ট পরিবেশে মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে এবং জীবাণুর রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। কীটপতঙ্গবাহী রোগ বিশেষ করে ব্লু টাং, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যানথ্রাক্স সহ বিভিন্ন পরজীবী ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যেতে পারে।

ভূমি অবক্ষয় ও এর প্রভাবক/কারণসমূহ

ভূমি অবক্ষয় বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বা মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং সাধারণভাবে ভূমির উৎকর্ষ হ্রাস পাওয়া। বাংলাদেশে ভূমি অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ঃ (১) লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতার ফলে ব্যাপক মৃত্তিকা অবক্ষয়, (২) ভূমি রূপান্তর ও বন উজাড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা অবক্ষয়, (৩) চাষাবাদ, নগরায়ণ প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের অবক্ষয়, (৪) নিবিড় চাষ পদ্ধতি এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার খন্ডকরণ এবং (৫) বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। উচ্চ ফলনশীল শস্যের নিবিড় চাষাবাদ এবং সেই সঙ্গে জমিতে ভারসাম্যহীন সার প্রয়োগ দেশের কৃষিজমির মারাত্মক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। ভূমি অবক্ষয়ের এ প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত বা সমন্বিত মৃত্তিকা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিমিত সার প্রয়োগ নিশ্চিত করে ভূমির এ অবক্ষয়কে রোধ করা দরকার।

ভূমি অবক্ষয়ের কারণে প্রাণিসম্পদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব

ভূমি অবক্ষয়ের দরুন জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে এবং শস্য উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রাণিসম্পদ খাতে মূলত প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পানিসৃষ্ট কারণে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির উপরিভাগ অপসারিত হয় এবং সেই সাথে মাটিতে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও সার সরিয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া বীজ, কাটিং ইত্যাদি স্থানচ্যুত হতে পারে অথবা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হতে পারে। এতে করে ফডার উৎপাদন হ্রাস পাবে। ক্ষয়িত মাটি আশেপাশের জলাধারে পতিত হয়, যার ফলে নাব্যতা হ্রাস পায় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নদী তীরবর্তী এলাকায় প্রায়শ নদী ভাঙ্গনের কারণে ঘরবাড়ি, আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এতে করে মানুষের পাশাপাশি গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি বাস্তুহারা হচ্ছে।

করণীয়

ভূমির অবক্ষয় রোধের জন্য সমন্বিত প্রয়াস জরুরি। সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস রোধ করতে হবে এবং এর পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ওপর জোর দিতে হবে।

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আধুনিক জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৪. নদীভাঙ্গন রোধের জন্য ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় বাঁধের ব্যবস্থা ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে।

৫. খামারিদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপদকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদের অনাকাংক্ষিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে সচেতন করে তুলতে হবে।

৬. উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত জাতের ঘাস চাষের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম জমিতে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. মানবসৃষ্ট যেসব কারণে ভূমির অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, পলিথিনের ব্যবহার, কলকারখানায় সৃষ্ট বর্জ্যের অনিরাপদ নিষ্কাশন ইত্যাদি রোধ করতে হবে।

৮. পরিবেশ বান্ধব পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

৯. গণমাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

১০. সর্বোপরি, একটি পরিবেশ বান্ধব নীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

দেশী আবহাওয়ার জন্য উপযোগী প্রাণিসম্পদের জাত উদ্ভাবন

অভিযোজন হলো জলবায়ুর উদ্দীপনা বা তার প্রভাবের ফলে প্রকৃতি বা মানব সিস্টেমে খাপ খাওয়ানো, যা উক্ত উদ্দীপনা বা প্রভাবজনিত কষ্ট হ্রাস করবে (IPCC, 2007)। প্রাণিসম্পদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদ্যমান গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাতের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউট/ সংস্থাকে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর

পদক্ষেপ হচ্ছে আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় জাতের প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিএলআরআই Japan International Cooperation Agency (JICA) এর কারিগরি সহায়তায় প্রথমবারের মতো দেশে 'শুভ্রা' নামে একটি বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির জাত উদ্ভাবন করেছে। সাদা পালকের লাল ঝুঁটি বিশিষ্ট লেয়ার মুরগিটি বছরে ২৮০-২৯৫টি ডিম দেয়। আশা করা যাচ্ছে যে, কর্মক্ষম নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিরাপদ খাদ্য যোগান ও পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে উদ্ভাবিত শুভ্রা লেয়ার মুরগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের আবহাওয়ার উপযোগী উদ্ভাবিত এই নতুন লেয়ার জাত খামারিদের প্রত্যাশা পূরণসহ সার্বিক পোল্ট্রি শিল্পে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এছাড়াও দেশে বিদ্যমান হিলি ও গলাছিলা জাতের মুরগির জাত উন্নয়নের জন্য বিএলআরআই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের একেক অঞ্চলে একেক জাতের প্রাণিসম্পদ দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অধিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকে থাকে। যেমন- উপকূলীয় ও হাওর এলাকার জন্য মহিষ, ভেড়া ও হাঁস/রাজহাঁস; পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, মুন্সিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এলাকার জন্য গাভী; ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী এলাকার জন্য ছাগল বেশি উপযোগী। সে কারণে দেশের যে অঞ্চলে যে জাতের প্রাণিসম্পদ বেশি টিকে থাকতে পারে বা উচ্চ অভিযোজন ক্ষমতা রাখে সে অঞ্চলে সে জাতের প্রাণিসম্পদ পালনে উৎসাহিত করা উচিত এবং এ জন্য সরকারি নানা উদ্যোগ থাকা উচিত।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং সংকর জাতের গবাদিপশু বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। অভিযোজন ক্ষমতা কম থাকায় পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনে এদের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। উৎপাদন ক্ষমতা কাংক্ষিত মাত্রায় বজায় রাখার জন্য খামারিকে বাড়তি যত্ন নিতে হয় যা খামারির আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে দেশি জাতের গবাদিপশু আবহাওয়ার সাথে অধিক মানানসই এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু। তাই আমরা যদি দেশি জাতের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করতে পারি তবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অনেকাংশে মোকাবেলা করা যাবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'রেড চিটাগাং' নামক একটি দেশি জাতের গরুর জাত উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। উচ্চ রোগপ্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন এবং দেশীয় আবহওয়ার সাথে অধিক মানানসই নতুন উদ্ভাবিত গরুর জাতটি দৈনিক গড়ে ৬-৬.৫ লিটার দুধ দেয় এবং এর দৈহিক ওজন হয় ১৮০-২০০ কেজি। এছাড়া পাবনা ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান দেশীয় জাতের গরুর জাত উন্নয়নের জন্য বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গবাদিপ্রাণির ঘাসের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বিএলআরআই বেশ কিছু ঘাসের জাত যেমন নেপিয়ার ১, ২, ৩, ৪ উন্নয়ন করেছে, যা দেশের আবহাওয়া উপযোগী হওয়ায় ঘাসের চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে দুটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। একটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, অন্যটি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। দুটি প্রতিষ্ঠানই সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বিএলআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ইনস্টিটিউট এ যাবৎ মোট ৬৬টি পোল্ট্রি, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, এনজিও এবং উদ্যোক্তা খামারিদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে, যার অনেকগুলোই মাঠ পর্যায়ে সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব প্রযুক্তির মধ্যে শুভ্রা জাতের মুরগির উদ্ভাবন, রেড চিটাগাং জাতের গরুর জাত উন্নয়ন, প্রাণিখাদ্যের সংকট নিরসনে নেপিয়ার-১, ২, ৩, ৪ জাতের উচ্চ ফলনশীল ঘাস উদ্ভাবন, তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার জন্য বিএলআরআই কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

১. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের গবাদিপ্রাণির ঘাসের চাহিদা পূরণে লবণসহিষ্ণু উন্নত জাতের ঘাসের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজ শুরু করা।

২. দেশের বন্যাপ্রবণ ও হাওর এলাকায় গবাদিপ্রাণির আপৎকালীন খাদ্য চাহিদা মোকাবেলায় ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি, টোটাল মিক্সড খাদ্য তৈরি, অপ্রচলিত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ফিডিং সিস্টেম ডেভেলপ করা।

৩. কমিউনিটি ভিত্তিক ভেড়া পালনে দেশের ডেল্টা এলাকার খামারিদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং কৃমি দমনের কৌশল নির্ধারণে কাজ করা এবং দেশের দক্ষিণ এলাকার মহিষের দুধ উৎপাদন ও কৌলিকমানের উন্নয়ন, ফিডিং সিস্টেম ডেভেলপ করার কাজ সফলভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এগিয়ে চলছে।

৪. পাহাড়ি এলাকা হতে সংগৃহীত বিভিন্ন পাহাড়ি মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু থেকে গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু অভিযে-াজন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে একই এলাকার কমিউনিটি পর্যায়ে সম্প্রসারণে বিভিন্ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত করার কাজ চলছে।

আগামী দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে ঃ

১. জলবায়ু পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন প্রকল্প শিরোনামে ০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, পরিবর্তিত জলবায়ুতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অভিযোজন কৌশল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা খামার পর্যায়ে পরীক্ষণ এবং সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু সংক্রান্ত মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে।

২. বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় "Livestock & Poultry Research and Development Plan of BLRI -2021" শিরোনামে বিএলআরআই একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেখানে আগামী দশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন মেয়াদে কোন কোন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া যেতে পারে তার একটি সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় কর্মরত বিজ্ঞানীদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ করতে হবে, যা চলমান রয়েছে।

৪. দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ছাড়াও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনারে ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে বিজ্ঞানীদের নিয়মিত অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে যা চলমান থাকবে।

জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা

১. প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ প্রদান ও সরকার ঘোষিত যথাযথ অনুদান প্রদান।

৩. দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা।

৪. বিভিন্ন গণমাধ্যম ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি।

৫. পশুপাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৬. তৃণমূল পর্যায়ে রোগ অনুসন্ধান, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা।

আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সরকারি মুখপাত্র বিভাগ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বলিষ্ঠ কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশে আরও কিছু আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তা সংক্রান্ত কিছু কিছু কার্যক্রম আঞ্চলিকভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড বা মিল্কভিটা কয়েক যুগ ধরে বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলে খামার মালিকদের সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান ও উৎপাদিত দুগ্ধ নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশে দুধ উৎপাদনে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

প্রাণিসম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে প্রাণিসম্পদকে উন্নয়নের মূলধারায় সন্নিবেশ করতে যে সব নীতিগত করণীয় কর্মপন্থা রয়েছে তা হলো ঃ

১. প্রাণিসম্পদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা।
২. প্রাণিসম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহের প্রোফাইল ও দুর্যোগ মানচিত্র তৈরি করা।
৩. প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক নীতি প্রণয়নে সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৪. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ যেমন, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি ইত্যাদি।
৫. ব্যাপকভিত্তিক বনায়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ।
৬. বিনষ্ট করা যায় না এমন পদার্থ যেমন প্লাস্টিকের নির্বিচার ব্যবহার এড়ানো।
৭. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও সবুজ কৃষি বিপ্লব ত্বরান্বিতকরণ।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নাম অগ্রগণ্য। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে সর্বাগ্রে দেশের দক্ষিণের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল তলিয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ভূমি অবক্ষয়ের দরুণ জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে এবং শস্য উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে যা প্রাণিসম্পদের খাদ্য সংকট তথা পুষ্টি প্রাপ্যতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কাজেই ভূমির অবক্ষয় রোধের জন্য সমন্বিত প্রয়াস অতি জরুরি। অন্যদিকে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা; এই লক্ষ্যে দেশীয় জাতের প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া; পরিবেশ বান্ধব পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা এবং খামারিদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপৎকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব মোকাবেলায় সচেতন করে তোলা। উন্নত বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলো এই সমস্যার জন্য দায়ী তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারের আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বোপরি দেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে বিএলআরআই উদ্ভাবিত এলাকা ভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহ সেখানকার মানুষের মাঝে হস্তান্তরে এবং যথাযথ ব্যবহারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা দেশের ঐ সমস্ত এলাকার প্রাণিসম্পদ রক্ষায় ও উৎপাদনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তথ্যপঞ্জি

Bandaranayaka, D.D. & Holmes, C.W. (1976). Changes in the composition of milk and rumen contents in cows exposed to a high ambient temperature with controlled feeding. Tropical Animal Health and Production Vol.8, pp. 38–46. ISSN: 0049-4747.

Lin, H., Jiao, H.C., Buyse, J. & Decuypere, E. (2006). Strategies for preventing heat stress in poultry. World's Poultry Science Journal, Vol.62, pp. 71-86. ISSN: 0043-9339

Kadzere, C.T., Murphy, M.R., Silanikove, N. & Maltz, E. (2002). Heat stress in lactating dairy cows: a review. Livestock Production Science, Vol.77, No. 1 (October 2002), pp. 59-91, ISSN: 0301-6226

Gonzalez-Esquerra, R. & Leeson, S. (2005). Effects of Acute Versus Chronic Heat Stress on Broiler Response to Dietary Protein. Poultry Science, Vol.84, pp. 1562–1569. ISSN: 0032-5791.

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে মৎস্য চাষ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা
(Fisheries Culture in Bangladesh: Combating Climate Change Impacts)

মোহাম্মদ জাহের [১], ড. মো. জুলফিকার আলী [২] ও ড. মো. খলিলুর রহমান [৩]

Summary

Fisheries sector assumes a unique status in Bangladesh. It has been playing a very significant role and deserves potential for future development in the agrarian economy of Bangladesh. Diversified fisheries ecosystems and fishing-based livelihoods are subjected to a wide range of climate-related variability, from extreme weather events such as- floods, droughts, changes in aquatic ecosystem structure and productivity to changing patterns of diversity and abundance of fish stocks. Human induced climate change is likely to cause major shifts in ocean system productivity and surface freshwater availability. Global ocean circulation patterns, sea level rise, changes in ocean salinity and pH, shifting coastal line and rise in inland water, increase sea surface temperature and extreme event all together would affect the enriched biological properties, diversity and distribution of aquatic species. Climate related changes in aquaculture production system can largely be grouped as: changes in air and inland water temperatures, changes in solar radiation, changes in sea surface temperature, changes in other oceanographic variables (currents, wind velocity and wave action etc.), sea level rise and water stress. These changes will in turn create physiological (growth, development, reproduction, disease), ecological (organic and inorganic cycles, predation, ecosystem services) and operational (species selection, site selection, sea cage technology) changes. Climate change impacted negatively on fish and fisheries of Bangladesh. Fish habitats including spawning habitats in the rivers, beels, haors and estuaries have been destroyed due to climate change. Consequently fish species diversity, density and production have been changed critically. Habitat restoration in the rivers, beels, haors and estuaries are urgently needed to protect fish & fisheries of Bangladesh. Technology has to be developed to cope with climate change effects.

[১] মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (সেল ফোন: ০১৭১২-০০৯৪৯৮)

[২] উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (ই-মেইল: zulfikar_bfri@yahoo.com; সেল ফোন : ০১৭১১-৭৮০৪২২)

[৩] প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (ই-মেইল: krahman2863@yahoo.com; সেল ফোন : ০১৭১১-৭২৬০৯৩)

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। যৌক্তিকভাবে বলা যেতে পারে, এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতি পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। মৎস্য, কৃষি, জীববৈচিত্র্য, স্বাস্হ্য, পানিসম্পদ, জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আশঙ্কাজনক। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্যখাতও আজ হুমকির মুখে। এর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জেলে সম্প্রদায়ের বসবাসের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর এখন দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাল থাকে, ফলে জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ ও সময় কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে। নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে দেশের মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং কমছে মাছের উৎপাদন। বাংলাদেশের ৫৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের অবস্থা সংকটাপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যসম্পদের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল বিশেষ করে নদী, বিল, হাওর ও মোহনার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য, ঘনত্ব ও উৎপাদন উদ্বেগজনকভাবে কমে গিয়েছে। মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য, ঘনত্ব ও উৎপাদনসহ মৎস্যসম্পদ রক্ষার জন্য মাছের বাসস্থান প্রতিস্থাপন ও সংরক্ষণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মৎস্যসম্পদের ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য খাতের ক্রমাবনতি ত্বরান্বিত হবে। জলজ সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই বেশ লক্ষণীয় এবং তা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান। জলবায়ু পরিবর্তন তথা তাপমাত্রা/খরার প্রকোপ বৃদ্ধি এবং ভূমি অবক্ষয়/সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানি অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মৎস্যচাষের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব ও তা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ের ওপর এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা জলবায়ু পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া, তবে মনুষ্যসৃষ্ট কিছু কিছু কারণে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। মৎস্যসম্পদ রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো চিহ্নিত করে তা নির্মূলের জন্য আমাদের এখনই সচেষ্ট হতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন করা এখন সময়ের দাবি।

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন তথা বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পৃথিবী নামক গ্রহের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীকে উষ্ণ এবং বসবাসের যোগ্য রাখার জন্য এর চারিদিক গ্যাস আববরণ দিয়ে ঢাকা। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অন্যায় আচরণের কারণে গ্যাসের এ আবরণ দিন দিন ক্ষয় হয়ে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। একদিকে মানুষ শিল্প-কারখানার জন্য অনবরত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করছে, অন্যদিকে কৃষি ভূমি বৃদ্ধির জন্য বন কেটে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এভাবে বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ফলে এন্টার্কটিকার বরফের পাহাড় ও হিমালয়ের বরফ গলা শুরু হয়েছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ দেশকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং করবে। অসময়ে বন্যা (১৮২২, ১৮৫৪, ১৯২২, ১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪, ২০০৭), প্রচন্ড খরা (১৯৫৭, ১৯৭৯, ১৯৭২), অসময়ে অতিবৃষ্টি, ঘন ঘন সাইক্লোন (সারণি ১), টর্নেডো (এপ্রিল ১৪, ১৯৬৯; এপ্রিল ১১, ১৯৭৪; এপ্রিল ০১, ১৯৭৭; এপ্রিল ২৬, ১৯৮৯), জলোচ্ছ্বাস (১৯৭০, ১৯৯১) (DMB 2008) ও নদীতে লবণাক্ত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদসহ কৃষি ও অন্যান্য সেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ফলে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিক নির্ভরতা এ বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মৎস্য, কৃষি, জীববৈচিত্র্য, স্বাস্হ্য, পানিসম্পদ, জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আশঙ্কাজনক। পৃথিবীর ১৯৩টি দেশের মধ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বিচারে তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (CRI) অনুযায়ী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত বাংলাদেশ (জার্মান ওয়াচ, ২০১০)। পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘনত্বের দেশ আজ সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের বরফগলা নদীর স্রোত বৃদ্ধি, নদীর দিক পরিবর্তন, অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সৃষ্টি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার পরিমাণ ও ব্যাপকতা বৃদ্ধিসহ সকল পরিবর্তনের অনিষ্টকর পরিণতির শিকার বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭০ মিলিয়ন জনসংখ্যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বাংলাদেশের সর্বত্র সমান নয়। দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ (Alam and Laurel 2005)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যেসব প্রভাব দৃশ্যমান সেগুলো হলো- বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন; শৈত্যপ্রবাহ, বন্যা, খরা, তাপদাহ, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সংঘটন সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে; ঋতু বৈচিত্র্যে পরিবর্তন; পানির গুণাগুণ এবং পরিমাণে পরিবর্তন; সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি; বিলম্বিত বর্ষা এবং অসময়ে বন্যা।

সারণি ১। বাংলাদেশে আঘাত হানা কয়েকটি সাইক্লোনের বিবরণ

সাইক্লোনের তারিখ	বাতাসের গতিবেগ(কি.মি./ঘন্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মি.)	মৃতের সংখ্যা
অক্টোবর ০৯, ১৯৬০	১৬০	৩.০-৪.০	৩,০০০
অক্টোবর ৩০, ১৯৬০	২০৮	৪.০-৬.০	৫,১৪৯
মে ০৯, ১৯৬১	১৪৪	২.৪-৩.৪	১১,৪৬৬
মে ২৮, ১৯৬৩	২০০	৪.২-৫.১	১১,৫২০
মে ১১, ১৯৬৫	১৬০	৩.৬-৪.০	১৯,২৭৯
ডিসেম্বর ১৪, ১৯৬৫	২০৮	৪.৬-৬.০	৮৭৩
অক্টোবর ০১, ১৯৬৬	১৪৪	৪.৬-৬.১	৮৫০
নভেম্বর ১২, ১৯৭০	২২৪	৬.০-৯.১	৩০০,০০০
মে ২৫, ১৯৮৫	১৫২	৩.০-৪.৬	১১,০৬৯
নভেম্বর ২৯, ১৯৮৮	১৬০	১.৫-৩.০	৫,৭০৮
মে ২৯, ১৯৯১	২২৫	৪.০-৫.০	১৩৮,৮৬৮
নভেম্বর ১৫, ২০০৭	২৪০	১.৮-২.৪	৩,৪০৬
মে ২৫, ২০০৯	৯০	১.৫-২.৪	১৯০

সূত্র ঃ DMB 2010

বাংলাদেশে মৎস্য খাত বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছ, ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি এবং ৩৬ প্রজাতির লোনাপানির চিংড়ি। বর্তমানে দেশের প্রায় ১ কোটি ৬৫ লাখ লোক জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ লোক তাদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে এ খাতের ওপর নির্ভরশীল (DoF, 2014)। বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। এছাড়াও বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে মৎস্য খাত। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১২-১৩ সালে দেশে মোট মাছ উৎপাদিত হয়েছে ৩৪.১০ লাখ মেট্রিক টন, যার বাজার মূল্য প্রায় ৪৩ হাজার কোটি টাকা (DoF, 2014)। এই বিপুল মৎস্যসম্পদ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে। এর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশির ভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র। নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাসের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর এখন দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাল থাকে, ফলে জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ ও সময় কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ

বাংলাদেশ জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- ক. বদ্ধ জলাশয়, খ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়, এবং গ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ।

ক. বদ্ধ জলাশয়

পুকুর-দীঘি, ঘের ও বাঁওড়কে বদ্ধ জলাশয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বদ্ধ জলাশয়ে বিভিন্ন জাতের মাছ ও মিঠা পানির চিংড়ির চাষ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৫৯ হেক্টর। এর মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৭১ হাজার হেক্টর পুকুর, ৫ হাজার ৪৮৮ হেক্টর বাঁওড় এবং উপকূল এলাকার চিংড়ি ঘেরের আয়তন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৭৪ হেক্টর (DoF, 2014)।

খ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়

বদ্ধ জলাশয় ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে স্বাদুপানির যে জলাশয় রয়েছে (যেমন-নদী, খাল, বিল, হাওর ও মৌসুমী প্লাবনভূমি) সেগুলোই হচ্ছে উন্মুক্ত জলাশয়। বর্ষাকালে উন্মুক্ত জলাশয়গুলো পানিতে ভেসে একে অপরের সাথে মিলে একাকার হয়ে পরিণত হয় বিশাল জলাশয়ে, যা মাছের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজনন, নার্সারি ও বিচরণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। দেশে উন্মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৮২৮ হেক্টর এবং এসব জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (DoF, 2014)।

গ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ

বাংলাদেশের মালিকানায় প্রায় ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা রয়েছে। এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ৩টি নদী, যথা- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে বাংলাদেশের দক্ষিণে একসাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এজন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকা অত্যন্ত উর্বর এবং মৎস্যসম্পদে ভরপুর। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের অন্যূন ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। গত ২০১২ সালের ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক

আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ-মায়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সমুদ্র তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে (DoF, 2014)।

মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রভাব

নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে দেশের মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং কমছে মাছের উৎপাদন। IUCN (2012) এর গবেষণামতে, বাংলাদেশে ৫৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের অবস্থা সংকটাপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্যসম্পদের ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য খাতের ক্রমাবনতি ত্বরান্বিত হবে। জলজ সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই বেশ লক্ষণীয় এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান। আর এগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. আবাসস্থলের অবক্ষয়, যেমন- বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ে পলি পড়ে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

২. লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, যেমন- লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে নড়াইলের নবগঙ্গা নদীর মিঠাপানির চিতল ও তারা বাইম মাছের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশের ফলে ঐসব এলাকায় স্বাদুপানির চিংড়ি চাষ হুমকির সম্মুখীন।

৩. রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব, যেমন- মৎস্য পোনা উৎপাদনের সুতিকাগার যশোর অঞ্চলে মা মাছে নতুন লার্নিয়াসিস রোগের বিস্তার।

৪. মাইগ্রেশন বা মুক্ত চলাচল বা অভিপ্রয়াণে বাধা, যেমন- বিভিন্ন নদীতে পলি পড়ে যাওয়ায় মাছের মুক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৫. প্রজনন ব্যাঘাত, যেমন- বৃষ্টিপাত, স্রোতের অভাব এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক অনুঘটকের তারতম্য হেতু মুক্ত জলাশয় যেমন- নদী, খাল-বিল, হাওর ও মৌসুমি প্লাবনভূমিতে মাছের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটছে।

৬. পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।

মৎস্য চাষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের চিরাচরিত ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা মাছ চাষ, প্রজনন, বিচরণকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি, অপর্যাপ্ত বৃষ্টির ফলে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খরা দেখা দেয়, যা মাছের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া মাছের জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। গত কয়েক বছরের বৃষ্টিপাতের অনিয়ম মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যেমন- মে-জুন মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় গোনাড (ডিম্বাশয়) পরিপক্ক হলেও প্রজননের প্রতিকূল পরিবেশ এবং তাপমাত্রা বেশি থাকায় মাছ কৃত্রিম প্রজননে পর্যাপ্ত সাড়া দেয়নি, ডিম শরীরে শোষিত (absorb) হয়ে গেছে। ফলে মাছের প্রজনন ব্যাহত হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়নি। পানির তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গেলে ব্রুড মাছ অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কারণ তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায় ফলে সমগ্র পোনা উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। আমাদের দেশে সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির শুরুতেই পুকুর-ডোবায় চাষীরা পোনা মজুদ করে। সুতরাং বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই পোনা মজুদের সময়ও পিছিয়ে যায়। এতে মাছের বৃদ্ধিকাল সংকুচিত হয়ে পড়ে, ফলে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তাপমাত্রা অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে খরার ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হয়, ফলে মাছ চাষের জন্য জলাশয়ে পর্যাপ্ত পানি থাকে না। মাছ বাজাজাতকরণের জন্য উপযুক্ত আকৃতি পাওয়ার আগেই জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে বাধ্য হয়েই অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ আহরণ করে মৎস্যচাষীকে

হয় কাঙ্ক্ষিত লাভের পরিবর্তে ক্ষতির পরিমাণ। ২০০৮ সালে সারা দেশে গড় বৃষ্টিপাত ২৩০০ মিমি হলেও বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১১৫০ মিমি, যা মাছ চাষ ও কৃষি উৎপাদনসহ জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন উৎপাদনমুখী সম্ভাবনাকে ভীষণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অসময়ে কুয়াশা ও আকাশ মেঘলা থাকা মাছ চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বরফগলা পানির ধারা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বেয়ে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাদুপানি এলাকায় লোনা পানি ঢুকেছে। এতে উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলোতে পুকুর, নদী, খাল, বিলসহ মুক্ত জলাশয়ে বিদ্যমান মাছের জীবন ও জীবনচক্র বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। তাপ বৃদ্ধিজনিত সম্প্রসারণের (Thermal expansion) কারণে সামুদ্রিক পানির আয়তন বাড়ছে। গলিত বরফের পানি সমুদ্রের পানির সাথে যুক্ত হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ১০ থেকে ১৫ সেমি। পৃথিবীতে প্রায় ৬৩.৪ কোটি মানুষ সামুদ্রিক উপকূলীয় এলাকায় বাস করে এবং পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ শহর উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় দেশ ও শহরগুলো আজ বিপদাপন্ন। পরিবেশবিদগণ ধারণা করছেন, যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে এবং বরফ গলছে তাতে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক উপকূলীয় দেশের স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে হালদা নদী রুই জাতীয় মাছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতি বছর হালদা নদীর অবদান প্রায় ৮০০ কোটি টাকা যা হালদায় প্রাপ্ত ডিম, উৎপাদিত রেণু এবং মাছ থেকে পাওয়া যায়। সাধারণত বৈশাখ মাসের প্রচন্ড তাপের পর একাধারে ৮-১০ ঘন্টা বজ্রসহ ভারি বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে নদীর বাঁকগুলোতে স্রোতসহ পানি বেশি ঘূর্ণায়মান থাকে এবং তখন পরিমিত তাপমাত্রায় রুই জাতীয় মাছ হালদা নদীতে ডিম ছাড়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হালদার ডিম উৎপাদনের স্বাভাবিক চিত্র আর আগের মতো নেই। বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের জৈবিক অবস্থার সঙ্গে বৃষ্টির সময়ে অমিল দেখা দিচ্ছে। ১৯৪৫ সালের দিকে হালদায় রুই জাতীয় মাছের ৫,০০০ কেজি রেণু পাওয়া যেত, বৃষ্টির তারতম্য এবং মনুষ্যসৃষ্ট নানা ব্যাঘাতের কারণে ২০০৪ সালে তা মাত্র ২০ কেজিতে এসে দাঁড়ায়। যদিও কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ায় ২০১১ সালে তা আবার বেড়ে ২৩৫ কেজি রেণু উৎপাদিত হয় (DoF, 2012) (সারণি ২)। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক মেজাজ-মর্জি বজায় থাকলে রুই-জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কমে যাবে।

সারণি ২। হালদা নদীর রুই জাতীয় মাছের ডিম এবং রেণু উৎপাদনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট ব্যাঘাতের প্রভাব

বছর	প্রজননের তারিখ	প্রজননের সময়	সংগৃহীত ডিমের পরিমাণ (কেজি)	১৯৪৫ সনের সংগৃহীত ডিমের হার (%)	উৎপাদিত রেণু পোনার পরিমাণ (কেজি)	১৯৪৫ সনের উৎপাদিত রেণু পোনার হার (%)
১৯৪৫*	৩০এপ্রিল	১৮:০০	৫০ ০০০	-	৫ ০০০	-
১৯৪৭*	২৩ এপ্রিল	২০:০০	৪৮ ৮০০	৯৭.৬	৪ ৯৬০	৯৯.২
১৯৪৮*	২৫ এপ্রিল	০৪:০০	৫০ ০০০	১০০.০	৫ ০০০	১০০.০
১৯৪৯*	০১ মে	২২:০০	৪৯ ৮০০	৯৯.৬	৪ ৯৯০	৯৯.৮
১৯৯৭	২৯ মে	২২:০০	১১ ৭০০	২৩.৪	৩০০	৬.০
২০০৩	০৩ জুন	১৬:০০	৮ ০০০	১৬.০	১৯৯	৪.০
২০০৪	২১ জুন	০৩:০০	৭৮০	১.৬	২০	০.৪
২০০৭	১৫ মে	১১:০০	১২ ৭০০	২৫.৪	৩০৭	৬.১
২০০৮	১৭ জুন	১৪:০০	৫ ০০০	১০.০	১২০	২.৮
২০০৯	২৪ মে	২৩:০০	৭ ৫০০	১৫.০	১৮০	৩.৬
২০১০	৩১ মার্চ	১৫:০০	৫ ৭০০	১১.৪	১৩৮	২.৮
২০১১	১৯ এপ্রিল ১৯ মে ১৬ জুন	০৯:০০ ০৬:০০ ১২:০০	৯ ৭০০	১৯.৪	২৩৫	৪.৭

সূত্র: *DoF 1952; Personal observations: 1997, 2003-2011

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যত্যয় ঘটেছে এবং বর্ষার সময়সীমায়ও পরিবর্তন আসছে। বিজ্ঞানীদের মতে আবার পৃথিবীর পরিবেশগত গড় তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মতো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ফলে হিমবাহ গলে শেষ হয়ে যাবে এবং বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় খাল, বিল, নদী এবং হাওরাঞ্চলের বিলগুলোতে পানির পরিমাণ কমে যাবে। সময়মত ডিম ছাড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি না হওয়ায় ৩২ প্রজাতির মাছই এখন বিলীন হওয়ার পথে এবং সংগত কারণেই হাওরে মাছের প্রাচুর্য দিন দিন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে ১২০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে দেশের বৃহত্তম বিল, চলনবিল মাছের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ২০১০ সালে ভরা মৌসুমেও চলনবিলে মাছের আকাল দেখা দেয়। প্রতি বছর চলনবিল থেকে প্রায় ২শ কোটি টাকার মাছ আহরণ করা সম্ভব (সমকাল, ৩০ জানুয়ারি ২০১০) হলেও এখন চলনবিলের দৃশ্য ভিন্ন রকম। বর্ষায় পর্যাপ্ত পানি না হওয়ায় চলনবিলের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যায়। বিলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পনি কম হওয়ায় বিলের পানির প্রশমিত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দেশীয় প্রজাতিসহ প্রায় সব ধরনের পোনা মাছ বহুলাংশে বিনষ্ট হচ্ছে। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা মাছের খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা কমিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি খাদ্য হজম প্রক্রিয়াও ব্যাহত করে, এতে মাছের Food Conversion Ratio (খাদ্য রূপান্তরের হার) বেড়ে যায় এবং দৈহিক বৃদ্ধির হারও কমে যায়।

নদী ও মোহনার ওপর প্রভাব

বাংলাদেশে ৭৬১টি নদী আছে যার মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী (Rahman & Akhter 2006)। আন্তর্জাতিক নদীর ৫৪টি ভারতের সাথে ও ৩টি মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের মোট ড্রেনেজ এরিয়া ১.৭৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার যার মধ্য দিয়ে বছরে প্রায় ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদী সিস্টেম থেকে বাংলাদেশ প্রায় ৯২% পানি পায় (BWDB 2002)। ভূ-মন্ডল উত্তপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে হিমালয়ের বরফ গলা ও অতিবৃষ্টির কারণে, প্রতি বছর বর্ষাকালে প্রায় সব নদীর পানির স্তর বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে এবং শীতকালে পানি কমে যাওয়ায় নদী শুকিয়ে যায় এবং মুখে পলি জমে নদী ও মোহনা ভরাট হয়। বর্তমানে মরা নদীর সংখ্যা ১৯০টি এবং ৯৯% নদীর গভীরতা কমে গিয়েছে (Rahman & Akhter 2006) (সারণি ৩)। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই বাংলাদেশের ৭৬১টি নদীতে পানির স্রোত আশংকাজনকভাবে কমে যায় (সারণি ৩) ফলে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদী ও মোহনা ভরাট হওয়ার প্রভাব মৎস্য, প্রাণী ও কৃষি সম্পদের ওপর পড়ছে এবং এর উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। জলজ পরিবেশ ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে।

সারণি ৩। বাংলাদেশের ৭৬১টি নদীর ভূ-গাঠনিক ও পরিবেশগত অবস্থা (বন্ধনীতে শতকরা হার)

(Co= Condition, Dd= Decreased depth, Df= Decreased fish diversity, Dm= Disrupted migration route, Dr= Dead rivers, Er= Erosion, Is= Increased siltation, Isn= Increased salinity, Lf= Low flow, Lp= Low fish production, Ms=Mouth silted, Of= Over-fishing, Po= Pollution, Ra= River-side agriculture, Sb= Sand bars, Ue= Unauthorised encroachment).

Co	রাজশাহী = ১৫১	খুলনা = ২০২	ঢাকা = ১৭৩	বরিশাল= ৬০	সিলেট = ৮৪	চট্টগ্রাম = ৯১	মোট = ৭৬১
Dd	১৫১ (১০০)	১৯৮ (৯৮)	১৭৩ (১০০)	৫৭ (৯৬)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৫৪ (৯৯)
Df	১৫১ (১০০)	১৯২ (৯৫)	১৬৯ (৯৮)	৫৩ (৮৯)	৮৪ (১০০)	৮৯ (৯৮)	৭৩৮ (৯৭)
Dm	১৩০ (৮৬)	১৭৮ (৮৮)	১৪৭ (৮৫)	৪৫ (৭৫)	৫৪ (৬৪)	৭৫ (৮২)	৬২৯ (৮৩)
Dr	৪৫ (৩০)	৪২ (২১)	৬১ (৩৫)	২ (৩)	২৭ (৩২)	১৩ (১৪)	১৯০ (২৫)
Er	১১৪ (৭৫)	১৭৭ (৮৮)	১৪২ (৮২)	৪৮ (৮০)	৭৬ (৯০)	৮৫ (৯৩)	৬৪২ (৮৪)
Is	১৫১ (১০০)	১৯০ (৯৪)	১৭৩ (১০০)	৫০ (৮৪)	৮৪ (১০০)	৮৭ (৯৬)	৭৩৫ (৯৬)
Isn	-	২০২ (১০০)	-	৬০ (১০০)	-	১৮ (২০)	২৮০ (৩৭)

Co	রাজশাহী = ১৫১	খুলনা = ২০২	ঢাকা = ১৭৩	বরিশাল= ৬০	সিলেট = ৮৪	চট্টগ্রাম = ৯১	মোট = ৭৬১
Lf	১৫১ (১০০)	২০২ (১০০)	১৭৩ (১০০)	৬০ (১০০)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৬১ (১০০)
Lp	১২৮ (৮৫)	১৮২ (৯০)	১৫৮ (৯১)	৫১ (৮৫)	৭৭ (৯২)	৭৬ (৮৪)	৬৭২ (৮৮)
Ms	-	৩৪ (১৭)	-	২৯ (৪৮)	-	১৬ (১৮)	৭৯ (১০)
Of	১৫১ (১০০)	২০২ (১০০)	১৭৩ (১০০)	৬০ (১০০)	৮৪ (১০০)	৯১ (১০০)	৭৬১ (১০০)
Po	১৩ (৯)	২১ (১০)	৩২ (১৮)	৮ (১৩)	১১ (১৩)	৯ (১০)	৯৪ (১২)
Ra	৫৮ (৩৮)	৫২ (২৬)	৬৮ (৩৯)	১১ (১৮)	৪২ (৫০)	২৪ (২৬)	২৫৫ (৩৪)
Sb	১০২ (৬৭)	১৫০ (৭৪)	১৪৬ (৮৪)	৪৬ (৭৭)	৬৬ (৭৯)	৫৩ (৫৮)	৫৬৩ (৭৪)
Ue	৬২ (৪১)	৬৫ (৩২)	৯৮ (৫৮)	৩২ (৫৩)	৪১ (৪৯)	৩৩ (৩৬)	৩৩১ (৪৪)

সূত্র ঃ Rahman & Akhter 2006

হাওরে মৎস্য বৈচিত্র্য এবং উৎপাদনের ওপর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য মানব-সৃষ্ট অভিঘাতের কারণে গত ৫০ বছরে হাওরের পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। উজানে পাহাড়ি এলাকায় বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে নদীতে ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে নদী এবং হাওরে তলানি পড়ার হার ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমস্ত পরিবর্তনের ফলে হাওরের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মৎস্যসম্পদের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার হাওরে ১৯৬৭-১৯৭০ সনে মাছের উৎপাদন ছিল ১০০,০০০ টন যা কমে ১৯৯১-১৯৯২ সনে ৩০,০০০ টনে এসে দাঁড়িয়েছে (Choudhury 2004)। সিলেট-ময়মনসিংহ বেসিন হতে রুই জাতীয় মাছ উধাও হয়ে যাচ্ছে। সুনামগঞ্জ হাওরে ১৯৬৭ সনে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন ছিল ৬৬.৪% যা কমে ১৯৮৪ সনে ১.৪% এসে দাঁড়িয়েছে (Tsai & Ali 1985)। একই কারণে হাকালুকি হাওর হতে ৩২ প্রজাতির মাছ উধাও হয়ে গিয়েছে (Adnan 1991)। বাঘাইড় এবং ঘইন্যা মাছ টাংগুয়ার হাওর হতে বিলুপ্ত হতে চলেছে, অন্য দিকে কাংলার হাওর হতে আংরোট এবং গুতুম মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টির ফলে হাইল হাওরে মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মনু নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কারণে কাউয়াদিঘি হাওর হতে ২৮ প্রজাতির মাছ হারিয়ে যেতে বসেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার হাওরে ১৯ প্রজাতির মাছের ঘনত্ব এবং উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছে। অনুরূপভাবে একই জেলার মিঠামইন উপজেলার হাওরে ১০ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে। নেত্রকোনা জেলার হাওর হতে নান্দিল এবং আংরোট মাছ হারিয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, রুই, গুজি, চিতল এবং বোয়াল মাছের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছে (Choudhury 2004)।

মাছের প্রজনন ক্ষেত্র, প্রজনন ঋতু ও অভিপ্রয়াণে পরিবর্তন

মাছের প্রজনন ক্ষেত্র, প্রজনন ঋতু, সময় ও অভিপ্রয়াণ প্যাটার্নের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে মেজর কার্প যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস এর চারটি স্টক বাংলাদেশের হালদা, আপার মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদীতে ডিম ছাড়তো। বর্তমানে আপার মেঘনা স্টক ভারতের মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখ এলাকার বরাক নদীতে, ব্রহ্মপুত্র নদীর স্টক ভারতের আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীতে, পদ্মা স্টক ভারতের বিহার রাজ্যের বধুয়া ও মহানন্দা নদীতে ডিম ছাড়ে (Hora 1945, David 1959)। ১৯৫০-১৯৬০ সালে হালদা নদীর স্টক উজানে নাজিরহাট ব্রিজের কাছে ডিম ছাড়তো (Tsai *et al.* 1981)। বর্তমানে হালদা নদীর স্টক ভাটিতে গড়দুয়ারা-মদুনাঘাট এলাকায় ডিম ছাড়ে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পলি জমে নোয়াখালী জেলার পরশুরাম উপজেলার কালিকাপুর নদীর সুস্বাদু ঘনিয়া মাছের এবং বগুড়া জেলার বাঙ্গালি নদীর রুই জাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র দু'টি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে (DoF 1952)। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক হতে মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রুডমাছ শীতকালীন আবাসস্থল থেকে ব্রিডিং মাইগ্রেশান শুরু করে। যথাসময়ে বৃষ্টির অভাবে নদী ও সংযোগ খালে পানি না থাকায় ব্রুডমাছ সঠিক সময়ে প্রজনন ক্ষেত্রে পৌছাতে পারে না। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বিশেষ করে স্বল্পসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পলি

বালি/পাথর নেমে বিল-হাওরের সাথে নদীর সংযোগকারী অংশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় ব্রুডমাছ ব্রিডিং মাইগ্রেশান করতে পারে না। অতীতে উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় ১০০টি নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, কিন্তু মেঘনা নদীর মুখ পলি ভরাটসহ বিভিন্ন নদী ভরাট হওয়ার কারণে ইলিশ মাছ উজানে মাইগ্রেশন করতে পারে না। পদ্মা নদীর সাথে বড়াল, গড়াই, মধুমতি ও আড়িয়াল খাঁ নদীর এবং যমুনা নদীর সাথে লৌহজং, কালীগঙ্গা ও ইছামতি নদীর সংযোগস্থল ভরাট হওয়ার কারণে রুইজাতীয় মাছের রেণু ফিডিং গ্রাউন্ডে মাইগ্রেশন করতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা ও যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় পুকুরে মাছের গোনাডের পরিপক্কতা, প্রজনন সফলতা, নিষিক্ততা, পরিস্ফুটন ও বাঁচার হার কমে গিয়েছে। ফলে হ্যাচারি শিল্প হুমকির মুখে পড়েছে।

মৎস্য চাষে ভূমি অবক্ষয়ের প্রভাব

দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো শিলাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, স্বল্পসময়ে প্রচুর বৃষ্টি। ফলে পানি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে, সঙ্গে নিয়ে আসছে নুড়ি, পাথর, বালি। আর এতে ভরাট হচ্ছে পাহাড়ি ছড়া, হাওর, নদী, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে জলজ সম্পদ তথা মৎস্যসম্পদের আবাসস্থল এবং প্রজনন-বিচরণ ক্ষেত্রে। এক সময় এ দেশের হাওর, বিল, নদী, নালায় কাজলি, ভেদা, খলিশা, পাবদা, গুলশা, মলা, ঢেলা, ইত্যাদি মাছ পাওয়া যেতো, যা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বৈরী জলবায়ুর প্রভাবে মাছ প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ পায় না ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিল, বাঁওড়, প্লাবনভূমির এ সমস্ত মাছ এ দেশের লাখো গরিব মানুষের পুষ্টির যোগান এবং জীবিকা অর্জনের প্রধানক্ষেত্র। ২০০৯ সালে খাল, বিল, প্লাবনভূমিতেও জুলাই মাস পর্যন্ত পানি না হওয়ায় দেশীয় মাছের প্রজনন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বৃষ্টির অনিয়মিত ধারায় বিশেষ করে স্বল্পসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে পলি/বালি/পাথর নেমে এসে হাওর বিল, নদী, খাল, ভরাট হচ্ছে, বিল থেকে নদী খালের সংযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাছের আবাসভূমি বিনষ্ট হচ্ছে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। রুই জাতীয় মাছ প্রজননের জন্য উজানে (Upstream) যেতে হয়। কিন্তু সংযোগকারী (বিল-হাওরের সাথে নদী) অংশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে বিধায় অনেক মাছ প্রজননস্হলে যেতে পারছে না। এতে করে নদী, বিল, হাওরে রুই জাতীয় মাছের প্রাচুর্য দিন দিন কমে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন তথা তাপমাত্রা/খরার প্রকোপ বৃদ্ধি এবং ভূমি অবক্ষয়/সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানির অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মৎস্যচাষের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব ও তা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ের ওপর সারণি ৪ ও ৫ তে আলোকপাত করা হলো-

সারণি ৪। তাপমাত্রা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রভাব ও করণীয়

জলাশয়ের ধরন	তাপমাত্রা ও খরার প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	· পুকুর শুকিয়ে যেতে পারে অথবা পুকুরে প্রয়োজনীয় পানির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। · হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে সমস্যা বেশ দৃশ্যমান এবং এ সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে মাছের পোনা প্রাপ্তিতে সংকট দেখা দিবে। · পুকুরের পানিতে অতিরিক্ত উদ্ভিদকণার স্জ্ন জমে পানি দূষণ ঘটতে পারে, যেমন-তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পুকুরে উর্বরতা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেলে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বুম দেখা দেয়।	· খননের মাধ্যমে পুকুরের গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। সাব-মার্সিবল টিউবওয়েল বসিয়ে ভূগর্ভ থেকে অথবা অন্যান্য উৎস থেকে পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। · হ্যাচারির পানির তাপমাত্রা কমিয়ে রাখার ব্যবস্হা করতে হবে। · পানির তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং দূষিত গ্যাস বের করার জন্য পুকুরে নিয়মিত হররা টানা যেতে পারে। প্লাঙ্কটন ব্লুম হলে হররা টেনে প্লাঙ্কটনের ব্লুম সরাতে হবে। · মাছ চাষের মৌসুমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জলাশয়ের ধরন	তাপমাত্রা ও খরার প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	· জৈবকণা পচনের মাত্রা বেড়ে পুকুরে/ঘেরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে জলজ জীবের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়ে মাছের মড়ক দেখা দিতে পারে। · মাছের নতুন নতুন রোগ দেখা দিতে পারে। · দীর্ঘ সময় ধরে খরা থাকলে মাছের শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ের সঠিক বৃদ্ধি ঘটে না, ফলে মাছের জৈবিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।	· শুষ্ক মৌসুমে পুকুরের কিছু জায়গায় কচুরিপানা দিয়ে পানির ওপর শেড তৈরি করা যেতে পারে। ফলে পানি বেশি গরম হলে মাছ/চিংড়ি সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। · সম্ভব হলে জলাশয়ে অ্যারেটরের ব্যবস্হা করতে হবে। · উচ্চতাপ সহিষ্ণু মাছের জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিরূপ পরিবেশে/অল্প পানিতে টিকে থাকতে পারে এ রকম মাছ চাষ করা যেতে পারে। · পুকুরে পুনঃ পুনঃ জৈব সার ব্যবহার করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্হা নেয়া যেতে পারে। · মাছের রোগবালাই প্রতিরোধের জন্য পুকুরের মাটি/পানির গুণাগুণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
উন্মুক্ত জলাশয়	· খাল-বিল, নদী-নালা ও হাওর-বাঁওড়ের পানি শুকিয়ে যেতে পারে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে মাছের আশ্রয়স্থল সংকুচিত হবে এবং প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ কমে যাবে। · উন্মুক্ত জলাশয়ে বসবাসকারী কিছু প্রজাতির মাছ আবাসস্হল পরিবর্তন করতে পারে। · মাছের প্রজনন ও অভিপ্রয়াণের সময় পরিবর্তন হলে প্রজাতি বৈচিত্র্য কমতে পারে। · মাছের রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। · কোন কোন মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে অথবা আবাস পরিবর্তন করতে পারে। ফলে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে। · বিল, খাল ও নদীর শুকিয়ে যাওয়া অংশ কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হতে পারে, ফলে মাছের আবাস সংকুচিত হতে পারে। · মাছের প্রাকৃতিক ও আহরণজনিত মৃত্যুহার বাড়তে পারে।	· খাল-বিল. নদী-নালা ও হাওর-বাঁওড় খনন বা সংস্কারের মাধ্যমে মাছের অভয়াশ্রম স্হাপন করে মাছের মজুদ রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশগতভাবে সংকটপন্ন জলাশয়ে বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা যেতে পারে। · তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলজ জীব তথা মৎস্যকুলের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই গবেষণা/জরিপ পরিচালনার পাশাপাশি এ সম্পদ রক্ষার বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। · মৎস্যজীবী তথা জলাশয়-সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদেরকে পরিবর্তিত ফিশিং গ্রাউন্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও তা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা নিতে হবে। · গবেষণার ফলাফল মৎস্যজীবীদের অবহিত করে তাদের দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। · প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে এবং মাছের প্রজননক্ষেত্র রক্ষা করতে হবে। ক্ষতিকর জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। · খরা মৌসুমে কৃষি সেচের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে জলাশয়ের সঠিক স্তর ধরে রাখা যায়। · শুষ্ক মৌসুমের জন্য মাছের সংকটকালীন আবাস চিহ্নিত করে তা রক্ষা করতে হবে।

জলাশয়ের ধরন	তাপমাত্রা ও খরার প্রভাব	করণীয়
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	· মাছ ও চিংড়ির প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতায় পরিবর্তন আসতে পারে। · সাগর ও উপকূলের মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য মৎস্যকুলের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। · ইলিশসহ অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির মাইগ্রেশন প্যাটার্নে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। · ফিশিং গ্রাউন্ডের পরিবর্তন হতে পারে। · প্রবাল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফলে প্রবাল সমৃদ্ধ এলাকায় মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও উৎপাদন কমে যেতে পারে। · সমুদ্রে অ্যাসিডিফিকেশন ঘটতে পারে, ফলে পানির পিএইচ কমে যেতে পারে। · সিডর, আইলা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়তে পারে।	· মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, হাঙ্গর, ইত্যাদি সাগরের সম্পদের ওপর (প্রজনন বৃদ্ধি, মাইগ্রেশন ও বিচরণক্ষেত্র) জলবায়ু পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। · প্রবালের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে করণীয় ঠিক করতে হবে। · গবেষণা জরিপের মাধ্যমে নতুন ফিশিং গ্রাউন্ড শনাক্ত করতে হবে। · প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং উপকূলীয় জেলে/মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় প্রাক্-প্রস্তুতি থাকতে হবে।

সারণি ৫। ভূমি অবক্ষয়/সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানির অনুপ্রবেশের প্রভাব ও করণীয়

জলাশয়ের ধরন	ভূমি অবক্ষয়/সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানির অনুপ্রবেশের প্রভাব	করণীয়
বদ্ধ জলাশয়	• উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ির ঘের ও মাছের পুকুর তলিয়ে/পাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। • উপকূলীয় এলাকায় পুকুরে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে রুই জাতীয় মাছসহ স্বাদুপানির মৎস্যচাষ ব্যাহত হবে। • পুকুর/ঘেরের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নষ্ট বা ব্যাহত হতে পারে। • উপকূলীয় এলাকায় গড়ে ওঠা রুই জাতীয় মাছের খামার ও হ্যাচারিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। • পুকুর পাড়ে সবজি/গাছপালা মারা যেতে পারে।	• চিংড়ির ঘের ও পুকুরের পাড় উঁচু ও মজবুত করতে হবে। • লোনাপানি সহনশীল মাছ (যেমন-ভেটকি, টেংরা, চিংড়ি, কাঁকড়া) চাষ করা যেতে পারে। খাঁচায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এসব চাষযোগ্য প্রজাতির পোনার সরবরাহ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। • বর্ষায় লবণাক্ততা কমে গেলে পুকুর/ঘেরে চিংড়ির সাথে রুই জাতীয় মাছ চাষ করা যেতে পারে। • মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের লোনা পানির মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়াসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ দেয়া যেতে পারে। • আপৎকালীন সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

জলাশয়ের ধরন	ভূমি অবক্ষয়/সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লোনাপানির অনুপ্রবেশের প্রভাব	করণীয়
উন্মুক্ত জলাশয়	• প্যারাবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নানা জাতের মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার প্রজনন ও নার্সারিক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • চিংড়ি ও পরিব্রাজনশীল ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মাইগ্রেশন প্যাটার্নে পরিবর্তন আসতে পারে। • উপকূলীয় এলাকায় প্রজাতি বৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসতে পারে, তথা স্বাদুপানির মাছের উৎপাদন কমে যাবে এবং কোন কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। • হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • স্বাদুপানির মাছের প্রজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। • প্রচলিত মৎস্য আহরণ মৌসুমে পরিবর্তন হতে পারে। • ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠিত অভয়াশ্রমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• ইলিশ ও চিংড়ি মাছের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা ও জরিপ করতে হবে। • স্বাদুপানির মাছের ওপর জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। • বিদ্যমান প্যারাবন রক্ষার পাশাপাশি নতুন করে প্যারাবন সৃজন করতে হবে। • লোনা পানি অনুপ্রবেশের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের ওপর কী প্রভাব পড়বে তার ওপর গবেষণা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। • হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ও রেণু পোনার ওপর লোনা পানি অনুপ্রবেশের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। লোনাপানি অনুপ্রবেশ বন্ধের ব্যবস্থা হবে সর্বোত্তম। • নতুন নতুন অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। • নদ-নদী, খাল-বিলে ভূমি অবক্ষয় ও নাব্যতা কমে যাওয়া রোধে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করতে হবে।
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	• সাগর ও উপকূলের ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে। • প্রবালের ক্ষতি হতে পারে এবং এর ওপর নির্ভরশীল মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য কমে যেতে পারে। • ফিশিং গ্রাউন্ডের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং মাছ ও চিংড়ির মাইগ্রেশনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। • উপকূল এলাকায় মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতায় পরিবর্তন আসতে পারে।	• সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি রোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। • ভূমি অবক্ষয়সহ অন্যান্য কারণে প্রবাল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যবস্হা করতে হবে। • গবেষণা জরিপের মাধ্যমে ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিত করতে হবে।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার পাশাপাশি মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আবশ্যক। নতুন নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে প্রয়োজন আরো বেশি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. মুক্ত জলাশয় ও প্লাবনভূমিতে খাঁচা ও পেনে মাছ চাষের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ,
২. লবণাক্ততা সহিষ্ণু মাছ চাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন,
৩. স্বল্প সময়ে চাষ করা যায় এমন প্রজাতি নির্বাচন ও চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন,
৪. দেশীয় মৎস্য প্রজাতিগুলো রক্ষার জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা,
৫. সমুদ্রে পরিবর্তিত ফিশিং গ্রাউন্ড সম্পর্কে গবেষণা,
৬. মাছের মাইগ্রেশন সম্পর্কে গবেষণা,
৭. পরিবর্তিত উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক গবেষণা।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশের জন্য একটি রূঢ় বাস্তবতা। বাংলাদেশের একার পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এ বিশাল সমস্যা সমাধান করে এর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মৎস্যসম্পদসহ সকল ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার একমাত্র উপায় হলো যথাযথ অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ। আর মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দৃশ্যমান ও সম্ভাব্য প্রভাবের প্রেক্ষিতে কী ধরনের অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- মৎস্য অধিদপ্তর, বিশেষ করে, বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সাথে অভিযোজনের নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সে সব অভিযোজন কার্যক্রম সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সাথে অভিযোজনের উপায় উদ্ভাবন ও সেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিকটস্থ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মৎস্য ক্ষেত্র অভিযোজনের উপায় সম্পর্কে যাবতীয় পরামর্শ ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নানা ধরনের সেবা গ্রহণ করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন।

তথ্যপঞ্জি

Adnan S. 1991. Floods, Peoples and the Environment: Institutional Aspects of Flood Protection Programs in Bangladesh. Research and Advisory Services, Dhaka.

Ahmed, A. U. (2006). Bangladesh climate change impacts and vulnerability: A Synthesis., Published by Climate change cell, Department of Environment, Component 4b, Comprehensive Disaster Management Program, Bangladesh. 70p.

Akhter J. N. and M. K. Rahman 2008. Geo-morphological, ecological and fish production status of 196 rivers of Khulna division, Bangladesh: a review. Journal of the Bangladesh Society for Agricultural Science and Technology, 5(1&2): 101-109.

Akhter J. N. and M. K. Rahman 2006-07. Ichthyodiversity in the Rivers and Estuaries of Barisal Division, Bangladesh. Bangladesh Journal of Training and Development, 19-20(1&2): 119-132.

Alam, M. and Laurel, M. (2005), Facing Up To Climate Change in South Asia, Gatekeeper Series, 118, International Institute for Environment and Development, London, UK.

BADC 2008. Ground water levels. BADC website.

BWDB 2002. Water flow in Rivers. Annual Report. BWDB, Dhaka.

Alam, M. S and A. M. O. Faruque ((2013). Fisheries Sector: Climate Change Impacts and Development Potential. In. National Fish Week 2013 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p.

Choudhury M. M. A. 2004. Shambabanamoy haor anchal (Potentials of haor areas). Weekly Robbar, 11 July 2004. 26(27): 18-19 (in Bangla).

David A. 1959. Observations on some spawning grounds of the Gangetic major carps with a note on carp seed resources in India. Indian Journal of Fisheries, 6: 327-343.

DoF (2012). National Fish Week 2012 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p.

DoF (2014). National Fish Week 2014 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p.

DoF (Directorate of Fisheries), East Bengal 1952. Annaul Report of the Directorate of Fisheries, East Bengal for the year 1951-1952. DoF, Dacca. 89 p.

DMB 2010. Disaster Management Bureau. GoB website.

FAO 1988. Land Form Resources and Climate Data Base. Technical Reports (5(1) & 3(1), UNDP/FAO. BDG/8/035.

Hora S. L. 1945. Analysis of factors influencing the spawning of major carps. Proceedings of the National Institute of Sciences, India, 11(3): 303-312.

IAEA 2002. Arsenic contamination of groundwater in Bangladesh. International Atomic Energy Agency, Vienna, URL: http://www-tc.iaea.org/http://www-tc.iaea.org/

Islam M. S. and F. Islam 2007. Arsenic Contamination In Groundwater In Bangladesh: An Environmental And Social Disaster. HydroInformatics and Water Management Program. University of Newcastle upon Tyne, Department Of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, UK.

IUCN (2012), Climate Change and Fisheries & Livestock in Bangaldesh Information Brief. International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Dhaka, Bangladesh.

Jahan, D. A., S. C. Chakrabarty and Y. Mahmud ((2014). Climate Change Impacts on Fisheries Sector of Bangladesh. In. Krishibid, 22 Year, No. 1-2. March-April 2014. Published by Krishibid Institution, Bangladesh.

MoEF (2009), National Adaptation Program of Action (NAPA). Ministry of Enviroment and Forests (MoEF), Government of the People's Republic of Bangladesh.

Rahman M. K., J. N. Akhter, A. Nima and M. A. Mazid 2007. Natural spawning of major carps in the River Halda, Chittagong: Status, problems, management and development. BFRI Technical Report No. 7. Bangladesh Fisheries Research Institute, Mymensingh-2201, Bangladesh. 32 p.

Rahman M. K. and J. N. Akhter 2007. Ichthyodiversity in the rivers of Bangladesh: A review. Journal of Taxonomy & Biodiversity Research, 1(1): 53-58.

Rahman M. K. and J. N. Akhter 2006a. River interlinking project of India- an overview. Journal of the Bangladesh Society for Agricultural Science and Technology, 3(1&2): 161-168.

Rahman M. K. and J. N. Akhter 2006b. Ichthyodiversity in the rivers and estuaries of Chittagong division, Bangladesh: a review. Journal of the Bangladesh Society for Agricultural Science and Technology, 3(1&2): 189-196.

Rahman M. K, J. N. Akhter, A. Nima and M. A Mazid 2003a. Studies on geo-morphology, ecology and fish production of the 92 rivers of Rajshahi Division, Bangladesh. Bangladesh Journal of Fisheries Research, 7(2): 141-150.

Rahman M. K, J. N. Akhter, S. U. Ahmed, A. Nima and M. A Mazid 2003b. Geo-morphological, ecological and fish production status of 61 rivers of Sylhet Division, Bangladesh: An overview. Bangladesh Journal of Fisheries, 26 (1-2): 97-111.

Tsai C. F. and M. Y. Ali 1985 Openwater fisheries (carp) management in Bangladesh. Fisheries Information Bulletin, 2: 51 p.

Tsai C. F., M. N. Islam, M. R. Karim and K. U. M. S. Rahman 1981. Spawning of major carps in the lower Halda River, Bangladesh. Estuaries, 4(2): 127-138.

Wahab, M. A. and Islam, M. A. (2009), Challenges of Climate Change to Fisheries and Aquacultrue in Bangladesh. In: Proc. Workshop on "Impacts of Climate change on livelihoods, Agriculture, Aquacuture and Fisheries Sector of Bangladesh" held in Bangladesh Agricutural University, Mymensingh. 01 October 2009, pp, 65-68.

Zaher, M., M. Z. Ali and M. A. Mazid (2008). World Food Security: The Challenge of Cimate Change in Bangladesh Fisheries Perspective. In: World Food Day 2008 Compendium. Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture. Published by Agricultural Information Service, Khamarbari, Dhaka, Bangladesh.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিলেট অঞ্চলের হাওর এলাকায় শস্য ও শস্য-বিন্যাসের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
(Influence of Climate Change on Crops and Cropping Systems in the Haor Areas of Sylhet Region)

ড. মোহাম্মদ নূর হোসেন মিঞা [১]

Summary

Effects of climate change on crops and cropping systems in the haor areas of Sylhet region have been reviewed in the backdrop of variability in rainfall and its patterns, temperature both maximum and minimum, humidity, duration of year-wise average rainy days etc. covering a period of about 15-20 years by using different secondary and published data and also in references to climate change effects on world and Bangladesh agriculture. At the same time, land utilization pattern and major crops and cropping patterns of Sylhet region have been presented in order that possible consequences of climate change can be focused and some remedial measures be suggested. It was observed that ground water table was declining moderately @ 0.1 – 0.5 m/yr in North-Eastern areas i.e., in Sylhet region. Summer and monsoon rainfalls showed increasing trends, while winter and critical period rainfalls had decreasing trends. Sylhet region exhibited an increasing trend in mean annual temperatures by + 0.13^0 C and + 0.26^0 C per decade (equivalent to +1.33 and +2.64^0 C per century) for data periods of 1948-2010 and 1980-2010 respectively. Recent data on total cultivable land of Sylhet division revealed that 28.7%, 27.0% and 11.7% land remained fallow during the Rabi, Kharif-I and Kharif-II seasons respectively, thus it recorded the lowest cropping intensity compared to other parts of the country. Various factors like scarcity of surface and irrigation water in Boro season, flash flood, lack of knowledge of farmers about new short duration crop varieties, delay and shifting of rainfall and changes of temperature due to climate change had been active behind such low performance. More land can be brought under cultivation by introducing short duration and submergence-resistant rice varieties, high value vegetables, summer vegetables, capsicum, sweet corn, summer bean, French bean with export potential, and low water absorbing crops like wheat, pulse and oils and maize. Side by side Rice cum Fish culture system and culture of spices and medicinal crops can be introduced through 'On Farm Research Basis'. Agriculture mechanization, cold storage, and establishment of an agro-based industry and marketing network can enhance agriculture production in the upcoming climate change.

[১] প্রফেসর, এগ্রোনমি অ্যান্ড হাওর এগ্রিকালচার বিভাগ, কৃষি অনুষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১০০

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মে ধীর লয়ে সংঘটিত একটি পরিবর্তন। এটা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল যা ভূপৃষ্ঠে মানুষের পরিকল্পনাহীন, অবিবেচনাপ্রসূত, নিয়ন্ত্রণহীন ও অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, শিল্পকারখানা গড়ে তোলা, প্রাকৃতিক বন উজাড় করা, অসংখ্য যানবাহন ব্যবহার ও যত্রতত্র কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতির সম্মিলিত ফলাফল। এটা হঠাৎ করেই ঘটেনি, খুবই ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছে তাই মানুষের কাছে এটা এ যাবৎ তেমন অনুভূত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এর বহুবিধ লক্ষণ ও মারাত্মক প্রভাব এতটাই স্পষ্ট যে তা এখন ভূপৃষ্ঠের সকল জল ও স্থলের ফসল, গাছপালা, বন-জঙ্গল, জীব-জগৎসহ মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সকল কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কৃষি যা প্রাণীকুল তথা সমগ্র মানব জাতির খাদ্য-নিরাপত্তাসহ সকল প্রকার জরুরি ও প্রয়োজনীয় রসদের যোগান দিয়ে আসছে, সেই কৃষিই আজ জলবায়ু-পরিবর্তনের প্রথম শিকার এবং অদূর ভবিষ্যতে এর সর্বগ্রাসী বিস্তারে মানবিক অস্তিত্ব মারাত্মক সংকটে পড়বে। জলবায়ু-পরিবর্তনের শিকার শুধুমাত্র উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশই নয় বরং এর অভিঘাত লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক কৃষক যারা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে বসবাস করছে তারাই এর প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হবে। এ সকল অঞ্চলের কৃষকরা এমনিতেই কোনো রকমে দিন এনে দিন খায় ও অতি নিম্নমানের জীবন যাপন করছে, তারা আজ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতে কৃষিকাজ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য-নিরাপত্তা, জীবন ও জীবিকা নির্বাহে প্রচন্ড বাধাবিপত্তির সম্মুখীন। বৈশ্বিক-জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের দায় যদিও অতি নগণ্য তবুও এদেশের কৃষি তথা সমগ্র দেশে বর্তমানে এর অভিঘাত মারাত্মকভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং তা ভবিষ্যতে আরো গুরুতর হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সিলেট বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের একটি প্রশাসনিক বিভাগ যা চারটি জেলা, যথা ঃ সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলবীবাজার নিয়ে গঠিত এবং এ সকল জেলার ভূ-গঠন ও প্রাকৃতিক জলাভূমি যা হাওর নামে পরিচিত, ছোট ছোট টিলা, পাহাড় ও সমতলভূমি দেশের অন্যান্য জেলা হতে ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চলটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলয়ের বাইরে নয়।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন সেকেন্ডারি সূত্র, জার্নাল, পেপার, বই, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্ট, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে পঠিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, সরকারি আবহাওয়া অফিস, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই-বুকলেট এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশিত নিবন্ধ ইত্যাদি হতে সংগৃহীত। প্রাপ্ত সূত্রের ভিত্তিতে গ্রিনহাউস প্রভাব, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফলন ও ফসলের উৎপাদনশীলতা, শস্য ও শস্যক্রম এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী কৃষি, বাংলাদেশের কৃষি এবং সর্বশেষ এলাকা ভিত্তিক সিলেট অঞ্চলের কৃষির ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে ও পড়বে, এবং এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, তাপমাত্রার পরিবর্তন, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি এবং জমির ব্যবহার, ফসল ও ফসলধারায় কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং নিরসনের কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরির্বতনের ফলাফল

ক. বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত

সারা বিশ্ব নিম্নের তিনটি বিষয়ে একমত যে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রবলভাবে পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছে (IPCC)।

(১) **গ্রিনহাউজ গ্যাসজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ঃ** বর্তমান পৃথিবীতে যে উষ্ণতা বৃদ্ধির লক্ষণ ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে তা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে, এর কারণ বায়ুমন্ডলে ক্রমাগতভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস যথা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম গ্যাস, নাইট্রাস গ্যাস ও ওজোন প্রভৃতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২) **বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধারার পরিবর্তন ঃ** অধিক উষ্ণতায় বিশ্বব্যাপী পর্বতমালায় বরফ গলনের ফলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি অন্যদিকে মাটির আর্দ্রতার (জলীয় বাষ্প) অধোগতি, উচ্চমাত্রায় বাষ্পীভবন কৃষি জমির শুষ্কায়নের মাধ্যমে খরায় মরুকরণ হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিমাত্রায়, অসম এবং অসময়ে বৃষ্টি একটি অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করবে অথবা বৃষ্টিহীন অঞ্চলে খরা সৃষ্টি করে ফসল উৎপাদন ব্যাহত করবে।

(৩) **সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ঃ** তাপমাত্রার অধিক পরিবর্তন এবং পর্বতমালায় বরফ গলনের ফলে বন্যা ও চাষযোগ্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে এবং বিপজ্জনক মহামারীর প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করবে।

খ. সমগ্র পৃথিবীর কৃষির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত

(১) **জিডিপি'তে কৃষির অবদানে ক্রমাবনতি ঃ** পূর্ব-এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৯৮০ তে জিডিপিতে কৃষির অবদান যেখানে ছিল ৩% তা ২০০২-২০০৩ এ নেমে এসেছে ০.১% এ; এটা হয়েছে কৃষিতে ফলনশীলতার ক্রমাবনতি, স্বল্প বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ফার্ম বৃদ্ধি, প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এগুলোতে আরো ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে (ESCAP, 2008)।

(২) **ফসলের ফলন হ্রাস ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ইতোমধ্যে ফসলের ফলনে ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে। যদিও ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধিতে উচ্চ ল্যাটিচুড অঞ্চলে ফলন কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে তবে তা ট্রপিকাল অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করবে। গম ও ভুট্টা তাপমাত্রার প্রতি খুবই নাজুক; যখনই তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সে. পেরিয়ে যায় তখন এ ফসলগুলোর ফলন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। ইতোমধ্যে এটা হিসেব করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণে ১৯৮১ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে গম, ভুট্টাসহ অন্যান্য প্রধান ফসলের ফলন প্রায় ৪০ মেগাটন প্রতি বছর হ্রাস পেয়েছে (IPCC)।

(৩) **খাদ্য নিরাপত্তায় অস্থিতিশীলতা ঃ** একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এ স্বর্ণযুগেও লাখ লাখ লোককে এখনো খাদ্য নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হয় নাই। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খাদ্য নিরাপত্তা আরো ঝুঁকির মুখে পড়বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোয়। এটা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ২০২০ সাল নাগাদ ৪৯ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ১৩২ মিলিয়ন মানুষ খাদ্যজনিত মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে (IFAD, 2009)।

(৪) **চাষযোগ্য জমি হ্রাস ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত হ্রাস ও পরিবর্তন, সময় আবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও এলাকার প্রসার, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যার পরিমাণ, ঘনঘন এবং উপর্যুপরি বন্যা হওয়া, মাটি ক্ষয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি ট্রপিকাল ও সাব-ট্রপিকাল দেশগুলোর জন্য মারাত্মক হবে, যদিও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে কিছু হাই ল্যাটিটুড দেশে কিছু চাষযোগ্য জমি বাড়তে পারে (জং ও চাই, ২০১১)।

(৫) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি ঃ** এটা রিপোর্ট করা হয়েছে যে, বৃষ্টিনির্ভর ধান চাষের জমি ক্রমাগতভাবে খরাপ্রবণ হচ্ছে এবং তা আরো তীব্র হবে। এশিয়ায় প্রায় ১০ মিলিয়ন হেক্টর উঁচু জমি ও ১৩ মিলিয়ন হেক্টর নিচু জমি ধান উৎপাদন হতে ঝরে পড়েছে। বন্যায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রায় ১০-১৫ মিলিয়ন হেক্টর ধানের জমি খরায় আক্রান্ত হয়েছে এবং উৎপাদনের যে পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তার বাজার মূল্য প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা আরো ক্ষতিকর হতে পারে যদি বন্যার প্রকোপ আরো বাড়ে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ আরো উঁচু হয়।

(৬) **ফসল ও ফসলধারার পরিবর্তন ঃ** বর্তমানে যে সকল ফসল ও শস্যজাত চাষ হচ্ছে এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে চাষ অযোগ্য হতে পারে, তখন তৎক্ষণাৎ চাষ করার জন্য ফসল ও শস্যজাতের অভাব দেখা দিবে এবং এদের নতুন ফসল ধারায় অভিযোজন কষ্টকর হবে। বর্তমানের মিক্সড ক্রপ ও গবাদিপশু পালন একক ফসলে রূপ নিতে পারে। এটা অনুমান করা হয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ আফ্রিকা মহাদেশের ৩% জমির ৩০ মিলিয়ন চাষী তাদের মিক্সড ক্রপ ও গবাদিপশু পালন থেকে একক পশুপালনে মাইগ্রেট করবে।

(৭) নতুন ধরনের রোগবালাই ও কীট-পতঙ্গের প্রকোপ ঃ বিশেষ করে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে নতুন নতুন রোগবালাই ও কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে যা ফসলের রোগ ও বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করবে। ছোট সমস্যা বড় আকারে দেখা দিতে পারে।

(৮) জীব-বৈচিত্র্যের হ্রাসমানতা ঃ বর্তমান পৃথিবীতে যে নানা জাত ও বৈশিষ্ট্যের ফসল, গাছপালা, মৎস্য, পশুপাখি প্রভৃতির জার্মপ্লাজম আছে, তা জলবায়ু পরিবর্তনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি এগুলোর বাস্তুসংস্থান হ্রাস পেয়ে সংরক্ষণ অনুপযোগী হতে পারে, আর তখনই দেখা দিবে মারাত্মক বিপত্তি যা মনুষ্য ও সকল জীব-জগৎকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

(৯) অভিযোজনজনিত সমস্যা ঃ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে ক্রপ-ইকোসিস্টেম, বপন ও রোপণ সময় পরিবর্তন ও ফসল অভিযোজন সমস্যা দেখা দিবে।

গ. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত

(১) লবণাক্ত এলাকা বৃদ্ধি ও চাষের জমি হ্রাস ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের নিচু এলাকার প্রায় ৪৭.০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৩২ ভাগ জমির সমপরিমাণ আক্রান্ত হবে (CEDR, 2009)। সমুদ্রপৃষ্ঠ ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ০.৫ মিটার উচ্চ হলে সমগ্র জমির প্রায় ১১% ভূমি আক্রান্ত হবে এবং এতে পানির নিচে তলিয়ে যাবে প্রায় ৩৯৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমি যা ছোট অথচ জনবহুল দেশের জন্য মারাত্মক ফল বয়ে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তনে লবণাক্ততা, খরা, সেচ ও পানির প্রাপ্যতা প্রভৃতি কৃষি কাজের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিবে (রশিদ ও ইসলাম, ২০০৭)।

(২) তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঃ ভূমি উপরিস্থ তাপমাত্রা ঋতুভেদে শীতকালে যদি ১.৪ ডিগ্রি সে. এবং বর্ষা মৌসুমে যদি ০.৭ ডিগ্রি সে. ওঠানামা করে তবে ২০৩০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ১.৩ ডিগ্রি সে. বাড়বে বলে পূর্বাভাষ প্রদান করা হয়েছে (রহমান ও আলম, ২০০৩)।

(৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল সাইক্লোনে সর্বোচ্চ নাজুক অবস্থায় আছে এবং বন্যার প্রতি তার নাজুকতা পৃথিবীর মধ্যে ৬ষ্ঠ (MoEF, 2008)। ১৯৭৫ হতে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা, সাইক্লোন ও বন্যা সংঘটন অবলোকন করলে দেখা যায় যে, এর মাত্রা ও প্রকোপ ক্রমশ উর্ধ্বগামী। অন্যদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৮ এর মাঝে ১৩টি ভয়াবহ সাইক্লোন বাংলাদেশকে আঘাত করেছে। ১৯৮৫ সনের ঘন্টায় ১৫৪ কিলোমিটার বেগের ভয়াবহ সাইক্লোনে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রায় ১১,০০০ মানুষ, ১,৩৫,০০০ পশু মারা যায় এবং প্রায় ৯৪,০০০ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং ৪০০ কিলোমিটার বাঁধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯৮৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তলিয়ে যায় এবং ২ মিলিয়ন টন ফসল নষ্ট হয় (আকন্দ, ২০১১)। এ ঘটনাসমূহ নির্দেশ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পেলে এদেশ আরো কত বড়ো ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

(৪) ভূ-উপরিস্থ সেচের পানির স্বল্পতা ও পানির লেয়ার নেমে যাওয়া ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাব হচ্ছে। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ও বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নিচে নেমে যাচ্ছে ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মধ্য বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নেমে যাচ্ছে তীব্রভাবে প্রতি বছর ০.৫-১ মিটার হারে, অন্যদিকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বাংশে মধ্যম মানের হ্রাস পাচ্ছে প্রতি বছরে ০.১-০.৫ মিটার হারে (সামসুদ্দোজা ও অন্যান্য, ২০০৯)।

(৫) ফলন হ্রাস ঃ উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমে তাপমাত্রার বৃদ্ধি , লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং মাটিতে রসের হ্রাস কী ধরনের প্রভাব ফেলে তার একটি পরীক্ষণে দেখা গেছে যে, এগুলো ফলন হ্রাস করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে তা শুধু অভিযোজনেই প্রভাব ফেলবে না বরং দরিদ্রতা, অবকাঠামো ও খাদ্য নিরাপত্তায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে (রহমান ও আলম, ২০০৩)।

ঘ. সিলেট ও নিকটবর্তী হাওর এলাকার ভূ-অবস্থান ও প্রকৃতি

সিলেট বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের একটি প্রশাসনিক বিভাগ যা সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলবীবাজার এই চারটি জেলা নিয়ে গঠিত এবং এ সকল জেলার ভূ-গঠন ও প্রাকৃতিক জলাভূমি যা হাওর নামে পরিচিত, ছোট ছোট টিলা, পাহাড় ও সমতলভূমি দেশের অন্যান্য জেলা হতে ভিন্ন প্রকৃতির। এ বিভাগে প্রায় ৭৯.৯৮ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। এ বিভাগের ৪টি জেলায় ২১৭টি হাওর যার জমির পরিমাণ ৫.০৪ লাখ হেক্টর এবং নিকটবর্তী নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসহ মোট হাওর ৩৭৩টি যার পরিমাণ ৮.৫৮ লাখ হেক্টর (সারণি ১ ও ২)। এ জেলার প্রধান নদী সুরমা ও কুশিয়ারা। সিলেট বিভাগের AEZ সমূহ হলো-AEZ-19, AEZ-21, AEZ-22 এবং AEZ-29। এ অঞ্চলের গড় নিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারিতে প্রায় ১০ ডিগ্রি সে. এবং গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সে. এপ্রিল মাসে এবং গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সে. এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪০০০ মি.মি।

সারণি ১। হাওর অধ্যুষিত জেলাসমূহ, আয়তন, হাওর সংখ্যা

জেলার নাম	মোট আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	হাওর আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	হাওরের সংখ্যা	ফসল নিবিড়তা (%)	জাতীয় ফসল নিবিড়তা (%)
সিলেট	৩.৪৯০	১.৮৯৯	১০৫	১৪৩	
সুনামগঞ্জ	৩.৬৭০	২.৬৮৫	৯৫	১১৬	
হবিগঞ্জ	২.৬৩৭	১.০৯৫	১৪	১২৮	
মৌলভীবাজার	২.৭৯৯	০.৪৭৬	৩	১৩৫	
বিভাগীয় মোট	**১২.৫৯৬**	**৬.১৫৫ (৪৮.৮৭)**	**২১৭**	**১৩০.৫ (গড়)**	১৯০ (MoA, 2012-13)
নেত্রকোনা	২.৭৪৪	০.৭৯৩	৫২	১৩০	
কিশোরগঞ্জ	২.৭৩১	১.৩৩৯	৯৭	১১৩	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১.৯২৭	০.২৯৬	৭	১২২	
সর্বমোট	**১৯.৯৯৮**	**৮.৫৮৪**	**৩৭৩**	**১২৬.৭ (গড়)**	

সূত্রঃ হাওর মাস্টার প্ল্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়।

সারণি ২। সিলেট বিভাগের চাষযোগ্য জমি ও পতিত জমি।

জেলার নাম	মোট চাষযোগ্য জমি হেক্টর)	পতিত জমির পরিমাণ (হেক্টর)		
		ফসল ঋতু		
		রবি	খরিফ-১	খরিফ-২
সিলেট	২০৮৭৫৯	১০৩৩৬২ (৪৯.৫১)	৩৯৬৯২(১৯.০১)	২১৯৬ (১.০৫)
সুনামগঞ্জ	২৭৬৪৩৪	১৯৮০৪ (৮.০০)	২৮৯১১ ৯১১.০০)	১৭০০০(৭.০০)
হবিগঞ্জ	১৮৪২০০	৬০৬৫০ (৩৩.০০)	৮৭০০০(৪৭.০০)	৭০০০০(৩৮.০০)
মৌলভীবাজার	১২৯১৩৫	৪৫১৬৪ (৩৫.০০)	৬০১৫০(৪৭.১২)	৪৩৯২(৩.৪০)
মোট	**৭৯৮৫২৮**			

সূত্রঃ ডিএই, বন্ধনির মধ্যে মোট চাষযোগ্য জমির %

ঙ. হাওর অঞ্চলের প্রধান প্রধান ফসল ও ফসল ধারা

· প্রধানত ধানভিত্তিক ক্রপিং প্যাটার্ন। · প্রায় ৯০.২ ভাগ জমি ধান ফসলের আওতায়। · বাংলাদেশের মোট ধান চাষের জমির (১০.৭৪ মিলিয়ন হেক্টর) এর মধ্যে ১৬% (১.৭৪ মিলিয়ন হেক্টর) হাওর অঞ্চলে অবস্থিত। · বিভিন্ন ধানের জমি যথাক্রমে আউস ধানের জমি ১৪.০, বোনা/গভীর পানির আমন ০.০৬, রোপা আমন ০.৬৬ এবং বোরো ০.৮৮ মিলিয়ন হেক্টর। · উচ্চ ফলনশীল ধানের আওতা ৯০.০% বোরোতে, ৭৫.০% আউসে এবং ৬৭.০% আমন চাষের অধীন।	· মোট ফসলি জমির মধ্যে ধান ব্যতীত অন্য ফসলের আওতায় প্রায় ৯.৮% জমি। · ভুট্টা ও গমের আওতায় ০.৭০% জমি। · ডাল, তেল ও সবজি চাষে ৬.৭০%। · নিট চাষযোগ্য জমির মধ্যে চা চাষে ৩.৭% ও ফল চাষে ০.৪২%। · ফল চাষের মধ্যে লেবু জাতীয়-লাইম ও লেমন, কাঁঠাল ও কলা প্রভৃতি প্রধান।

সারণি ৩। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন

সিলেট জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন ঃ	**সুনামগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন ঃ**
পতিত-বোনা/রোপা আউস-রোপা আমন পতিত-পতিত-রোপা আমন বোরো-পতিত-রোপা আমন বোরো-পতিত-পতিত সবজি-পতিত/বোনা আউস-রোপা আমন	বোরো-পতিত-পতিত পতিত-পতিত-রোপা আমন বোরো-পতিত-রোপা আমন পতিত-রোপা আউস-রোপা আমন বোরো/সরিষা/আলু-রোপা আউস-রোপা আমন সবজি-পতিত-রোপা আমন
হবিগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন ঃ	**মৌলভীবাজার জেলার প্রধান প্রধান ক্রপিং প্যাটার্ন ঃ**
বোরো-পতিত-পতিত পতিত-পতিত-রোপা আমন বোরো-পতিত রোপা আমন পতিত-রোপা আউস-রোপা আমন বোরো/সরিষা/আলু-রোপা আউস-রোপা আমন সবজি-পতিত-রোপা আমন	পতিত-পতিত-আমন পতিত-আউস-রোপা আমন বোরো-পতিত-আমন বোরো-পতিত-পতিত সবজি-পতিত-রোপা আমন

চ. সিলেট অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকসমূহ ও কৃষির ওপর এর প্রতিক্রিয়া

সিলেট অঞ্চলের আবহাওয়া মূলত ট্রপিক্যাল মনসুন, যা গ্রীষ্মে উষ্ণ ও আর্দ্র এ দুয়ের সংমিশ্রণ এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট যে সমস্যগুলো এ অঞ্চলের ফসল ও ফসলধারায় ভূমিকা রাখে, সেগুলো হলো-

১. বৃষ্টিপাত ঃ অতিরিক্ত অথবা কম, আবার কখনো কখনো আগাম বা দেরিতে বৃষ্টিপাত হওয়া এবং বৃষ্টিপাতের সময় পরিবর্তন ফসল ও ফসল ধারা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। চিত্র-১ এ পাঁচ বছরের মাসিক গড় বৃষ্টিপাত লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, জুন মাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, তবে ১৯৯৭-২০০১ সময়ে আবার মে মাসে সর্বোচ্চ ৯৮৫ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। অন্য ৫ বছরের গড়ের ট্রেন্ড হলো ২০০২-২০০৬ > ২০০৭-২০১১ > ১৯৯২-১৯৯৬। জানুয়ারি ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি নেই বললেই চলে। অন্য দিকে ১৯৯৭ সাল হতে ২০১৪ সালের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় লক্ষ করলে দেখা যাবে (চিত্র-২) কিছু ব্যতিক্রম বাদে প্রায় দুই বছর অন্তর অন্তর বৃষ্টিপাত ওঠা-নামা করেছে তবে সাধারণ ট্রেন্ড হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত

শীতকালে ক্রমাগত কমছে এবং গ্রীষ্মকালে বাড়ছে। আবার ২০১২ সালে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৬১২ মিমি, সেখানে ২০১৪ সালে তা ৩৩৫৫ মিমি (চিত্র-২)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের দিনের উপাত্তও একই ট্রেন্ড প্রদর্শন করছে (চিত্র-৩)।

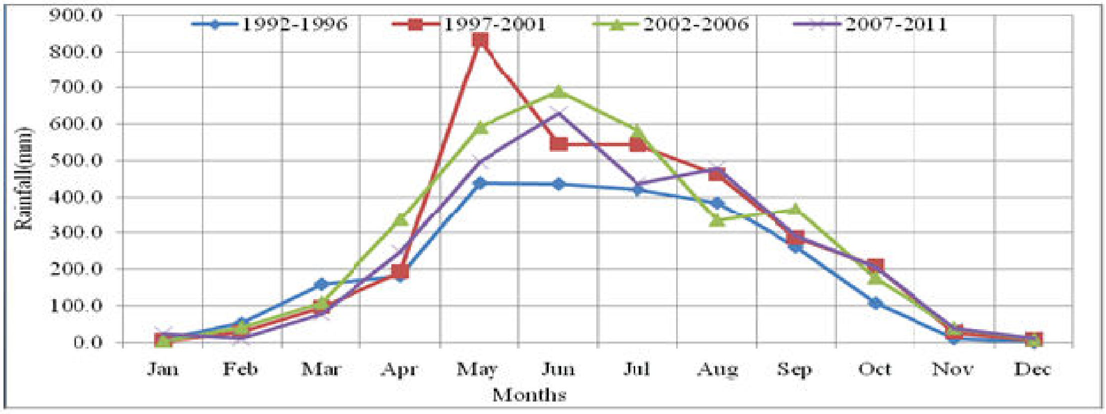

চিত্র-১। পাঁচ বছরে সিলেটের গড় মাসিক বৃষ্টিপাত ১৯৯২-১৯৯৬ থেকে ২০০৭-২০১১

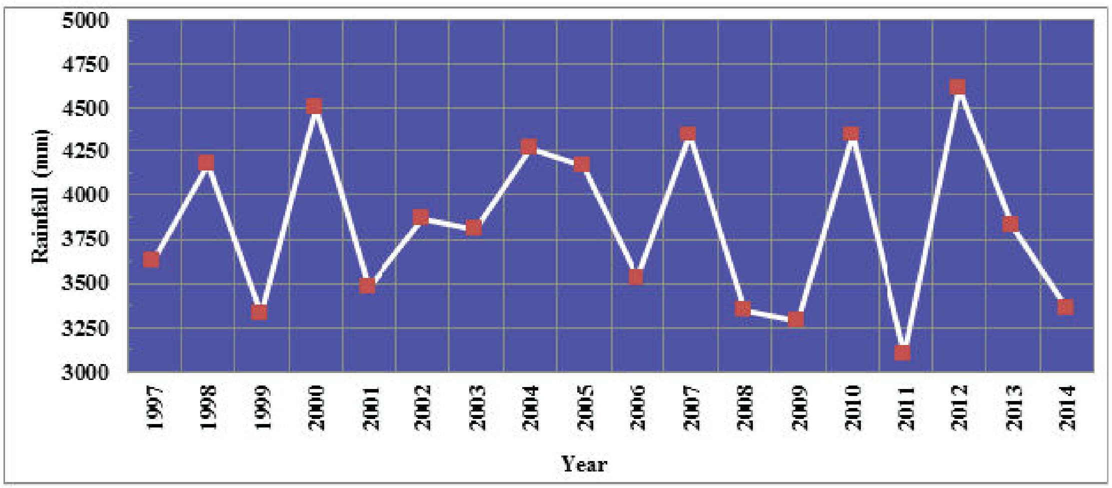

চিত্র-২। সিলেটের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৯৭ হতে ২০১৪

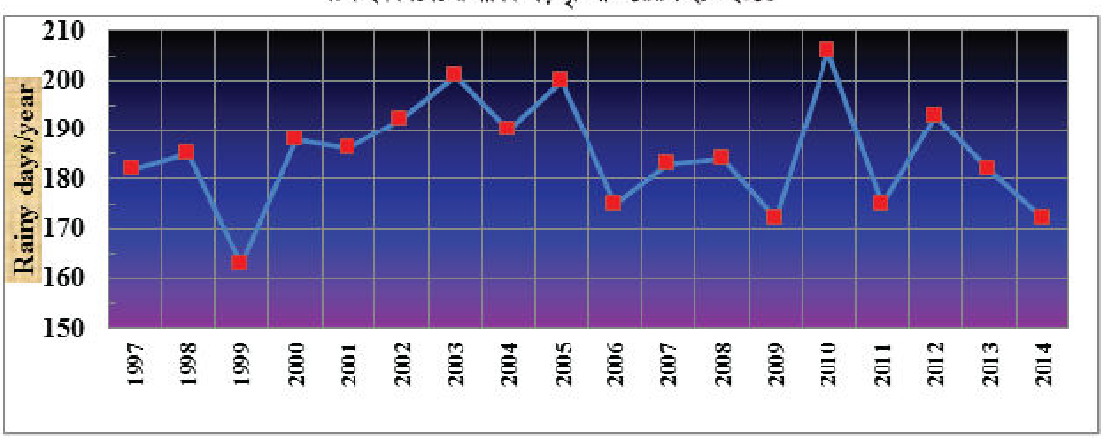

চিত্র-৩। সিলেটের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের দিন ১৯৯৭ হতে ২০১৪

২. তাপমাত্রা ঃ সিলেটের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ও এর ট্রেন্ড লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে (চিত্র-৪), যদিও বছর হতে বছরে তারতম্য আছে। অন্যদিকে বিপরীত ধরনের ট্রেন্ড সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় লক্ষ করা যায় (চিত্র-৫)।

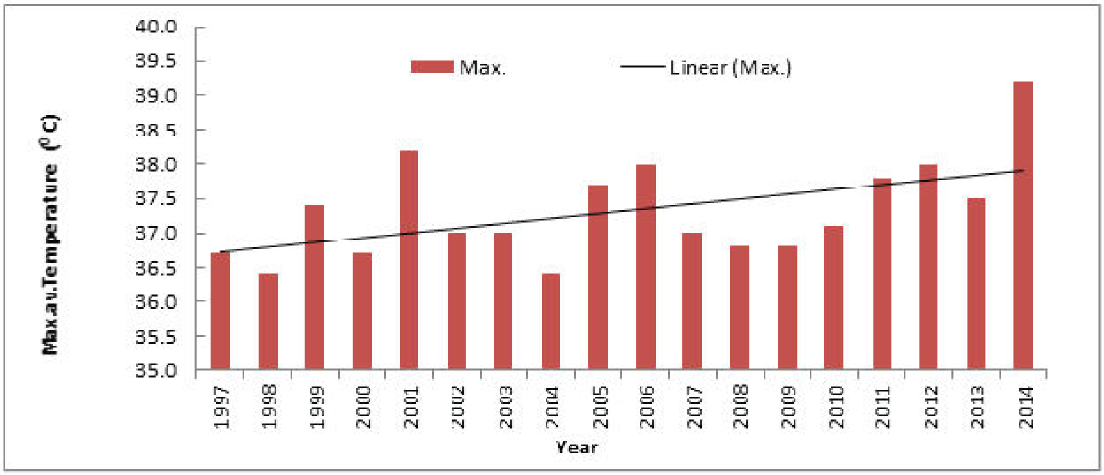

চিত্র-৪। সিলেটের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ১৯৯৭ থেকে ২০১৩ এবং এর ট্রেন্ড

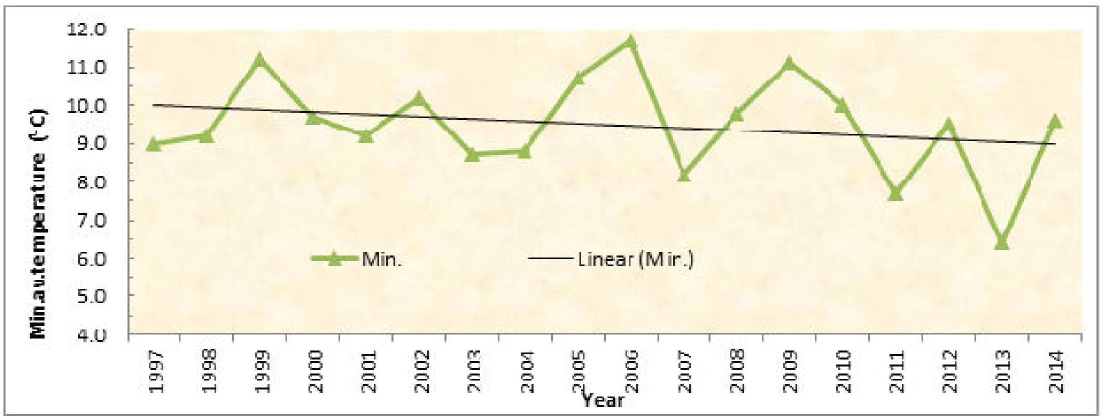

চিত্র-৫। সিলেটের সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ এবং এর ট্রেন্ড

৩. বায়ুর আর্দ্রতা ঃ সিলেটের আর্দ্রতা ও এর ট্রেন্ড লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তা ক্রমাগত কমছে (চিত্র-৬) যদিও বছর হতে বছরে তারতম্য আছে।

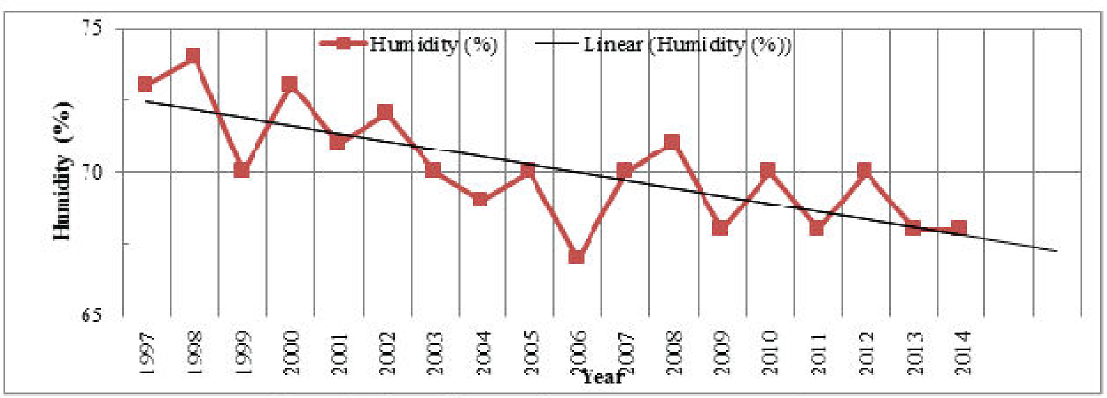

চিত্র-৬। সিলেটের বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ১৯৯৭ হতে ২০১৪ এবং এর ট্রেন্ড

(সূত্র ঃ ১ থেকে ৬ চিত্রের ডাটা আবহাওয়াবিদ জনাব সাঈদ আহমেদ চৌধুরী, সিলেট আবহাওয়া অফিস এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ছ. সিলেট অঞ্চলে চাষযোগ্য জমি পতিত থাকার প্রধান প্রধান কারণসমূহ ঃ

১. ভূ-উপরিস্থ সেচের পানির অভাব।

২. বোরো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে মাটির নিচের পাথর ও গ্যাসের উপস্থিতি।

৩. বোরো মৌসুমে ধান পেকে আসা ও কাটার মুহূর্তে হঠাৎ করে পাহাড়ি ঢল।

৪. আউস মৌসুমে দেরি করে বৃষ্টি হওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বৃষ্টিপাতের সময় পরিবর্তনে বৃষ্টিনির্ভর আউস ধান চাষ করতে না পারা।

৫. দীর্ঘ মেয়াদের আমন ধানজাত চাষ ও তা দেরি করে কাটায় মাটিতে রসের অভাবে তৈল জাতীয় বা অন্য রবি ফসল চাষ না করতে পারা।

৬. জমির প্রকৃত মালিক দেশে না থাকা ।

৭. জমির মালিক কর্তৃক প্রায়শই বর্গচাষী পরিবর্তন।

৮. ফার্ম শ্রমিকের অপ্রতুলতা।

৯. যদিও সিলেট অঞ্চলে প্রচুর ধনবান লোকের বসবাস কিন্তু তাঁরা অতিদ্রুত কৃষি থেকে অধিক মুনাফা প্রত্যাশী; দীর্ঘ মেয়াদ ছাড়া কৃষি হতে মুনাফা লাভ করা দুরূহ।

১০. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং এটি আধুনিক ফসলজাত অথবা উৎপাদন ও বিপনন প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই।

১১. কৃষির যান্ত্রিকায়ন চেষ্টার অভাব।

১২. অনেক সময় অপরিকল্পিত রাস্তা ও কালভার্ট বা ব্রিজ নির্মাণের জমি হতে পানি নিষ্কাশনে অসুবিধা।

১৩. নতুন নতুন ফসলজাত এবং প্রযুক্তি নিয়ে সরেজমিন গবেষণার অপ্রতুলতা।

১৪. মাটির অম্লতা ও তা দূরীকরণে ডলোচুনের ব্যবহার কম।

জ. সমস্যাসমূহ দূরীকরণে করণীয়

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ দু'ভাবে দূর করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(ক). নতুন নতুন ফসল চাষ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে-

১. বোরো মৌসুমে নিচু জমিতে স্বল্প মেয়াদি হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল/মডার্ন জাতের ধানের চাষ করা যাতে হঠাৎ বন্যা আসার আগেই কর্তন সম্ভব হয়।

২. বন্যা সহনশীল ও জলমগ্ন থাকলেও বেশ কিছুদিন টিকে থাকতে পারে এমন ধানের জাত চাষ করা যেমন, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২, ব্রিধান-৫২ ও ব্রিধান-৫৩।

৩. বোরো ও আমন মৌসুমে সুঘ্রাণযুক্ত সরু ধানের চাষ এলাকা বাড়ানো এবং স্বল্প মেয়াদি বৃষ্টিনির্ভর আউস ধানের জাত ব্যবহার।

৪. গ্রীষ্মকালে ও রবি মৌসুমে হাই ভ্যালু সবজি চাষ যেমন, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও শিম, রবিতে শিম, সুইটকর্ন, বেবিকর্ন, ক্যাপসিকাম, ফ্রেঞ্চবিন ও অনুরূপ ফসল। নানাজাতের লেবু চাষ যেগুলোর বিদেশে রপ্তানির সুযোগ আছে এবং সর্বোপরি এয়ারপোর্ট সুবিধা রয়েছে।

৫. স্বল্প মেয়াদি আমন কর্তনোত্তর মাটির রস ব্যবহার করে কম পানি খরচ করে যে সকল ফসল করা যায় সে ব্যবস্থা নেয়া যেমন, গম, ডাল জাতীয় শস্য, তেল ফসল ও ভুট্টা চাষ করা।

৬. মসলা জাতীয় শস্যের এলাকা বাড়ানো যেমন, আদা, হলুদ, তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি এবং বিভিন্ন ওষধি গাছ/ফসল এবং আগার চাষের আধুনিক প্রযুক্তি বের করা।

৭. নতুন নতুন ক্রপিং প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করা ও স্বল্প মেয়াদি ডাল ও তেল ফসল আমন - পতিত প্যাটার্নে ফিট করা।

৮. যেহেতু প্রচুর হাওর এলাকায় কম গভীর পানি দাঁড়িয়ে থাকে সে কারণে ধান-মাছ চাষ উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে যৌথ গবেষণা করা প্রয়োজন।

৯. আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন উপাত্ত ও ফসল বিশেষ করে ধানজাতের মেয়াদ ব্যবহার করে নতুন ক্রপিং মডেল বের করা।

১০. মাটির অম্লতা দূর করার জন্য ডলোচুন ব্যবহার করা।

(খ). বিনিয়োগের মাধ্যমে

১. কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন।

২. কোল্ড স্টোরেজ তৈরি।

৩. মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. কৃষি পণ্যের রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৫. কৃষির যান্ত্রিকায়ন।

উপসংহার

১. কৃষির সংগে জড়িত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা ও কৃষকসহ সকলের অংশগ্রহণমূলক ও হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

২. দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা আছে বিধায় সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

৩. কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি কমানোর জন্য কৃষি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত ব্যক্তিদের প্রচুর ট্রেনিং প্রদান ও সরেজমিন গবেষণা প্রয়োজন।

৪. কৃষি-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ।

৫. ক্রপ ইন্সুরেন্স চালু করা।

৬. জমি পতিত রাখা বিষয়ে বর্গাচাষী-জমি মালিক বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন সূত্র ও সেমিনারে পঠিত পেপার ও অন্যান্য সূত্র হতে নেয়া হয়েছে; ভুলক্রমে কোন লেখকের নাম উল্লেখ না থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য প্রচলিত শস্য পদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ সুপারিশমালা

(Existing Cropping Systems and Future Recommendations for Adaptation to Climate Change in Southern and South-Western Regions of Bangladesh)

ড. মো. আলিমুর রহমান [১]

Summary

Bangladesh is recognized worldwide as the most vulnerable country to climate change. The anticipated climate change impacts are salinity, sea level rise, flooding, drought, extreme weather condition, erratic rainfall, cyclone (like SIDR, Aila, Mahasen) and storm surges, which are considered as the major constraints for sustaining agricultural production particularly in the southern and south-western regions of Bangladesh. Therefore, the region that once deemed as 'Granary of Bengal', has now turned to be a low productive agricultural region in the country. The land types of these regions are mainly medium high to low. The medium low and low type of lands remain under submerged condition in almost every year (generally during June-October) due to tidal water or rainfall in monsoon season that are not utilized for crop production. Increase of salinity in soil and water, lack of suitable variety/technology and irrigation water also restrict the crop production. The total cultivable land areas in Barisal, Faridpur and Khulna regions are mostly double-crop type and they stand at 46%, 84% and 35% respectively in Barisal, Faridpur and Khulna regions, while triple-crop areas are only 26%, 29% and 13%, respectively. The cropping intensities for these regions are very low, which are only 206%, 202% and 158% respectively. Therefore, proper attention must be given to develop and introduce climate-friendly suitable technologies for enhancing agricultural production. Out of 2.86 million hectares of coastal and off-shore lands about 1.056 million ha of arable lands are affected by varying degrees of salinity. However, lands affected by salinity in southern and south-western regions are about 0.84 million hectare. Apart from soil salinity, varying degrees of water salinity also exist in the rivers. Lands affected by tidal flooding and soil and water salinity attribute remarkable negative impacts on cropping systems, even to some extent on the rural livelihoods. The salinity causes unfavorable environment and hydrological situation restricting the normal crop production throughout the year and very few crops/cultivars can survive or produce economic yield in severe saline soils. Therefore, introduction of saline tolerant varieties are necessary in the areas for combating the adverse impacts of climate change. The tidal flooding dominates the overall cropping systems in southern and southwest regions.

Although the crops within the polder (embankment for water control) are safe but the standing crops outside the polder are damaged severely by tidal water. Nevertheless, indiscrimnate use of chemical fertilizers and pesticides, short winter duration, cyclone and tidal wave and so on incur lower productivity of crop and also

[১] উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষিতত্ত্ব), আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, রহমতপুর, বরিশাল

cause the degradation of soil and environment. The cropping systems of southern and south-western regions (Barisal, Faridpur and Khulna regions) reveal that Boro-Fallow-T.aman, Boro-Fallow-Fallow, Fallow-Fallow-T. aman, Fallow - T. aus - T. aman, and Grasspea - T. aus - T. aman cropping patterns cover the major proportion of land. Therefore, a remarkable amount of land remains fallow under rice based cropping systems. Lack of appropriate agricultural technology and planning resulted in further deterioration of the situation. The season-wise total fallow land in Barisal region is 0.72 million hectare, which is 31% of the total cultivable land. However, fallow lands in Faridpur and Khulna regions are 0.42 million ha (28.09%) and 0.35 million ha (38.83%), respectively. The Research Institutions under National Agricultural Research System (NARS) of Bangladesh have so far developed a number of modern commodity & non-commodity technologies. Apart from these, the local people have also developed a good number of environment-friendly innovative technologies (e.g. floating vegetable garden, sorjan, pit culture, etc.) that could be introduced and disseminated under the existing cropping systems in similar ecosystems. The agricultural research and development programs should, therefore, be so redesigned as to take up a series of climate-friendly and location-specific technologies that will help improve the food security situation as well as the conservation of natural resources of the southern and south-western regions of Bangladesh.

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপ্রবণ (Vulnerable) অবস্থানে আছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবগুলি হলো- মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, উপকূলীয় বন্যায় জমি তলিয়ে যাওয়া, প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন (সিডর, আইলা, মহাসেন ইত্যাদি) এবং উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের (বিশেষ করে বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চল) নিচু এলাকাসমূহ উপকূলীয় বন্যা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের (Tidal flooding and erratic rainfall) কারণে প্রায় সারা বছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ সময়ের জন্য (সাধারণত জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) পানিতে তলিয়ে থাকে। সে কারণে এ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বেশ ঝুঁকির মধ্যে আছে যা জনগণকে বিপদময় ও অনিরাপদ করে তোলে। ইতঃপূর্বে পরিচালিত গবেষণার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের ফলে আগামী বছরগুলিতে এ অবস্থার আরও অবনতি হবার সম্ভাবনা আছে। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ অদূর ভবিষ্যতে আরো তীব্র হবার সম্ভাবনা আছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করতে পারে। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জোয়ারের বন্যা দ্বারা ফসলের জমি প্লাবিত হওয়া, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় (সিডর, আইলা, মহাসেন ইত্যাদি) দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ফসল উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। এর ফলে এ অঞ্চলে বিভিন্ন মৌসুমে ব্যাপক এলাকা পতিত থাকে যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। ধান হচ্ছে এ অঞ্চলের একক প্রধান ফসল এবং পতিত-পতিত-ধান ও আউশ-আমন-পতিত হচ্ছে প্রধান শস্য বিন্যাস। জোয়ার প্লাবন ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট মাটির জলাবদ্ধতা ফসল উৎপাদনের জন্য একটি বিরাট হুমকি। এর ফলে বছরের বেশির ভাগ সময়ই দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলসমূহ পতিত থাকে। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চল, যা এক সময় বাংলার শস্যভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হতো তা বর্তমানে স্বল্প কৃষি উৎপাদন অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত চার দশকে (১৯৭৩-২০০৯) উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ০.২২৩ মিলিয়ন হেক্টর (২৬.৭০%) নতুন এলাকা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে (SRDI, 2010)। পূর্বে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, আগামী ২০৮০ সাল নাগাদ সমুদ্রের উচ্চতা ৬২ সেমি বৃদ্ধি পেলে বর্তমান অপেক্ষা শতকরা প্রায় ১৩ ভাগের (০.৪৭ মিলিয়ন হে.) অধিক এলাকা বর্ষা মৌসুমে এবং ১০ ভাগ (০.৩৬ মিলিয়ন হে.) এলাকা শুষ্ক মৌসুমে প্লাবিত হবে। এক্ষেত্রে পোল্ডারের বাইরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিপ্রবণ এলাকাগুলি হলো পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল এবং ঝালকাঠি জেলা (IWM-CEGIS, 2007)। এমতাবস্থায়, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যাকবলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা উন্নতির করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানভিত্তিক উপযুক্ত অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাসমূহ (Adaptive measures) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ভূমির শ্রেণী

সারণি ১ এ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির বিভিন্ন শ্রেণী (উঁচু, মধ্যম উঁচু. মধ্যম নিচু, নিচু, অতি নিচু) এবং এর আওতায় ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এ অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি মধ্যম উঁচু, মধ্যম নিচু প্রকৃতির। তবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নিচু ভূমিও রয়েছে। মধ্যম নিচু ও নিচু ভূমি বর্ষাকালে বা জোয়ারের পানিতে প্রায় প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় (সাধারণত জুন-অক্টোবর মাস) পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ফলে এ সকল জমিতে সফলভাবে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না অথবা জমি পতিত থাকে। অপরদিকে উঁচু ও মধ্যম উঁচু ভূমি সারাবছর ব্যাপী ফসল আবাদের জন্য উপযোগী হলেও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ফসলের উপযুক্ত জাত/প্রযুক্তি ও উপযুক্ত সেচের পানির অভাবে লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ভূমির শ্রেণীভিত্তিক উপযুক্ত জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলির প্রচলন করা আবশ্যক।

সারণি ১। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস

জেলা	ভূমির শ্রেণী (হেক্টর)					
	উঁচু	মধ্যম উঁচু	মধ্যম নিচু	নিচু	অতি নিচু	মোট
বরিশাল অঞ্চল						
বরিশাল	১১০০১ (৬)	৯৮৬৯৭ (৫৬)	৪৮৩৪৮ (২৮)	১৭৫৫০ (১০)	৪ (০**)	১৭৫৬০০
পিরোজপুর	৩৫৪৬ (৪)	৪৯১৯৯ (৬০)	২৩৩৮৮ (২৮)	৬২৮১ (৮)	-	৮২৪১৪
ঝালকাঠি	২৮৬১ (৫)	৩৩০০৩ (৬১)	১৭৮৯৫ (৩৩)	৪৯৭ (১)	-	৫৪২৫৬
পটুয়াখালী	২৫৮৪ (১)	৯৫০০০ (৪৪)	৮৪৩৭৬ (৩৯)	৩২০৪০ (১৫)	-	২১৪০০০
বরগুনা	৩১৫৩ (৬)	৫৫২৭ (৭)	৪৮৩৪৯ (৮৫)	-	-	৫৭০২৯
ভোলা	৫০২১০ (২৬)	১২০৯৩৫ (৬৩)	২১১৭০ (১১)	৬০ (০.০৩)	-	১৯২৩৭৫
মোট	**৭৩৩৫৫ (৯)**	**৪০২৩৬১ (৫২)**	**২৪৩৫২৬ (৩১)**	**৫৬৪২৮ (৭)**	**৪**	**৭৭৫৬৭৪**
গড়	**১২২২৬**	**৬৭০৬০**	**৪০৫৮৮**	**৯৪০৫**	**১**	**১২৯২৭৯**
ফরিদপুর অঞ্চল						
গোপালগঞ্জ	৮৭১৫ (৮)	২৬১৮৯ (২৪)	৩৭২০২ (৩৪)	৩৭০১২ (৩৪)	-	১০৯১১৮
ফরিদপুর	৩৪৯৯০ (২১)	৮০৫০৭ (৪৭)	৪৯০১৬ (২৯)	৫৫৮৮ (৩)	-	১৭০১০১
মাদারীপুর	২২৪৯৫ (২৪)	৪৬৩৪৫ (৫০)	১৯৬৬৬ (২১)	৩৩৭১ (৪)	-	৯১৮৭৭
রাজবাড়ি	১০৯৩৪ (১১)	৩২৪৬৩ (৩২)	৪০৯৩২ (৪১)	১১৫৭১ (১২)	৪০১৩ (৪)	৯৯৯১৩
শরিয়তপুর	৬৭১৮ (৮)	২৮১২৯ (৩৪)	৪১৮৩০ (৫০)	৭১৯০ (৯)	-	৮৩৮৬৭
মোট	**৮৩৮৫২ (১৫)**	**২১৩৬৩৩ (৩৯)**	**১৮৮৬৪৬ (৩৪)**	**৬৪৭৩২ (১২)**	**৪০১৩ (১)**	**৫৫৪৮৭৬**
গড়	**১৬৭৭০**	**৪২৭২৭**	**৩৭৭২৯**	**১২৯৪৬**	**৮০৩**	**১১০৯৭৫**
খুলনা অঞ্চল						
খুলনা	১৩৩৬৪ (৭)	১৩৩১৩৮ (৭৩)	২৭০০৬ (১৫)	৭৯৫২ (৪)	-	১৮১৪৬০
সাতক্ষীরা	৪৬৫৮৮ (২৩)	১৪৮২১৭ (৭৩)	৮৪৩৫ (৪)	-	-	২০৩২৪০
বাগেরহাট	১৩৬২৫ (৮)	১৩৪০০১ (৭৫)	২৩৪৭৬ (১৩)	৭৬৫৮ (৪)		১৭৮৭৬০
মোট	**৭৩৫৭৭ (১৩)**	**৪১৫৩৫৬ (৭৪)**	**৫৮৯১৭ (১০)**	**১৫৬১০ (৩)**	**-**	**৫৬৩৪৬০**
গড়	**২৪৫২৬**	**১৩৮৪৫২**	**১৯৬৩৯**	**৭৮০৫**	**-**	**১৮৭৮২০**

* দ্রষ্টব্য ঃ উঁচু ভূমি (স্বাভাবিক বন্যা স্তরের ওপরে), মধ্যম উঁচু ভূমি (স্বাভাবিক বন্যার সময় ৯০ সেমি পর্যন্ত পানির উচ্চতা), মধ্যম (>৯০-১৮০ সেমি পানি), নিচু (>১৮০-৩০০ সেমি পানি) এবং অতি নিচু (>৩৬০ সেমি উচ্চতার পানি)

** বন্ধনির ভেতরের মান ভূমির শতকরা হার নির্দেশ করে

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ফসল পদ্ধতির (Cropping Systems) আওতায় জমির পরিমাণ

বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৯০, ৫.০৬ এবং ৫.৬০ লক্ষ হেক্টর (সারণি-২)। ফসল পদ্ধতির আওতায় জমির পরিমাণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশিরভাগ জমি দ্বি-ফসলি যার মধ্যে প্রায় ৪৬% বরিশাল অঞ্চলে, ৮৪% ফরিদপুর ও ৩৫% খুলনা অঞ্চলে অবস্থিত। অপরদিকে অঞ্চলসমূহের মধ্যে একক ফসলি জমি সবচেয়ে বেশি খুলনা অঞ্চলে (প্রায় ৬৩%)। পক্ষান্তরে বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলে একক ফসলি জমির পরিমাণ যথাক্রমে ২১% এবং ১৮%। বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে ত্রি-ফসলি জমির পরিমাণ যথাক্রমে ২৬%, ২৯% ও ১৩% এবং ফসলের নিবিড়তা যথাক্রমে ২০২%, ২০৬% ও ১৫৮%। কাজেই দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ফসলের উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধির জন্য লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

সারণি ২। অঞ্চল-ভিত্তিক ফসল পদ্ধতির আওতায় জমির পরিমাণ

জেলা	জমির আয়তন (হেক্টর)						ফসলের নিবিড়তা (%)
	মোট আবাদযোগ্য জমি	একক ফসলি জমি	দ্বি-ফসলি জমি	ত্রি-ফসলি জমি	চার-ফসলি জমি	মোট ফসলি জমি	
			বরিশাল অঞ্চল				
বরিশাল	১৭৫৬০০	৪৪৯৩৩	১০৩২৪৬	২৭৩৯৬	২৫	৩৩৩৭১৩	১৯০
পিরোজপুর	১৫০৭৮৭	২৪৪২০	৪৭৬১৫	১০৩৭৯	-	১৫০৭৮৭	১৮৩
ঝালকাঠি	৫৩৭৭২	১১৯৫৮	৩৩১০৩	৯১৯৫	-	৫৪২৫৬	১৯৫
পটুয়াখালী	২১৪০০০	৫০৬০০	৯৫৫১০	৬৭৪৯০	-	৪৪৪০৯০	২০৮
বরগুনা	১০৩২৩৫	৩৩২১০	৩৮৯১০	৩১১১৫	-	২০৪৩৬৫	১৯৮
ভোলা	১৯২৩৭৫	১৭৮০৮	৮৯৮৪৪	৮৪৭২৩	-	৪৫১৬৬৫	২৩৫
মোট	**৮৮৯৭৬৯**	**১৮২৯২৯(২১)***	**৪০৮২২৮(৪৬)**	**২৩০২৯৮(২৬)**	**২৫**	**১৬৩৮৮৭৬**	**-**
গড়	**১৪৮২৯৫**	**৩০৪৮৮**	**৬৮০৩৮**	**৩৮৩৮৩**	**৪**	**২৭৩১৪৬**	**২০২**
			ফরিদপুর অঞ্চল				
গোপালগঞ্জ	১১৪৬৬৩	৩৯৫২১	৫৪৬০২	১৪৯৯৫	-	১৯২০৮৯	১৭৬
ফরিদপুর	১৪৩২২০	১২৮৮৩	৮৩৪২৪	৪৬৯১৩	-	৩২০৪৭০	২২৪
রাজবাড়ি	৭৭৭৪৭	৬০৮৫	৩৯৬০১	৩০১৯৯	১৮৬২	১১২৭৬৬	২৩৫
মাদারিপুর	৮৪১৫৪	১৬১২০	১৯৮০৪৮	৩৮৭৩০	৮০০	৫৩১৬০৬	১৯৭
শরিয়তপুর	৮৬৪৮০	১৮৯৮০	৫২০৮০	১৫৪২০	-	১৬৯৪০০	১৯৬
মোট	**৫০৬২৬৪**	**৯৩৫৮৯(১৮)**	**৪২৭৭৫৫(৮৪)**	**১৪৬২৫৭(২৯)**	**২৬৬২(১)**	**১৩২৬৩৩১**	**-**
গড়	**১০১২৫৩**	**১৮৭১৮**	**৮৫৫৫১**	**২৯২৫১**	**৫৩২**	**২৬৫২৬৬**	**২০৬**
			খুলনা অঞ্চল				
খুলনা	১৮১৪৬০	২৭৭৬২	৬৮৫৯১	২৯০৭০	-	১২৫৪২৩	২০১
সাতক্ষীরা	২০৩২৪০	১৬১১৩৮	৬২০৮৭	৩৪১২২	-	২৫৭৩৪৭	১৫১
বাগেরহাট	১৭৮৭৬০	১৬৭৪০১	৬৬৬৯৭	১১৮০০	-	২৪৯৮৯৮	১২১
মোট	**৫৬৩৪৬০**	**৩৫৬৩০১**	**১৯৭৩৭৫**	**৭৪৯৯২**	**০**	**৬৩২৬৬৮**	**-**
গড়	**১৮৭৮২০**	**১১৮৭৬৭(৬৩)**	**৬৫৭৯২(৩৫)**	**২৪৯৯৭(১৩)**	**০**	**২১০৮৮৯**	**১৫৮**

দ্রষ্টব্য ঃ * বন্ধনির ভেতরের মান জমির শতকরা হার নির্দেশ করে

চরাঞ্চল

নদীতীর, অববাহিকা ও সমুদ্র মোহনায় নব্য সৃষ্ট ভূমিই সাধারণত চর নামে অভিহিত। মূলত নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বা গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এর অভ্যন্তরে বা তীরে তলানি জমে যে নতুন বালুময় ভূখন্ড সৃষ্টি হয় তাকেই চর বলে। বাংলাদেশে মোট চরাঞ্চলের পরিমাণ ১৮.১৮ লক্ষ হেক্টর। দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ১.৮২ লক্ষ হেক্টর চরাঞ্চল আছে যা সাধারণত রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে চাষের অনুপযোগী থাকে (Khan *et al.*, 2008)। কারণ রবি মৌসুমে মাটিতে যথেষ্ট রসের অভাব থাকে এবং খরিফ-১ মৌসুমে তা আগাম জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। বর্তমানে চর এলাকা আকস্মিক জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় যার ফলে নাবি রবি ও খরিফ-১ মৌসুমের ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়াও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং এর ওপর কৃষকদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকায় অধিকাংশ চরের জমি রবি ও খরিফ মৌসুমে পতিত থাকে। তবে চরাঞ্চলে প্রচলিত ফসল ও শস্য পদ্ধতির উন্নয়ন এবং নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে।

সারণি ৩। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চরাঞ্চলের পরিমাণ

ভূতাত্ত্বিক স্তর	জেলা	চরাঞ্চলের আয়তন (হেক্টর)
গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি	বরিশাল	৮৮৮০
	ফরিদপুর	৪৮৭৪৫
	মাদারীপুর	৩৫৮
	রাজবাড়ী	২৫০৬৪
	শরিয়তপুর	১২৬০৫
মেঘনা প্লাবনভূমি	ভোলা	৮৬১০৮
মোট		১৮১৭৬০

উৎস ঃ Khan *et al.*, 2008

লবণাক্ততা

বাংলাদেশের শতকরা ৩০ ভাগের বেশি নিট চাষযোগ্য ভূমি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু এ এলাকার সকল ভূমি মূলত মাটির লবণাক্ততা ও জোয়ারের প্লাবনের কারণে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২.৮৬ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় ও সমুদ্র তীরবর্তী ভূমির মধ্যে প্রায় ১.০৫৬ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য ভূমিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা বিদ্যমান (SRDI, 2010)। তবে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ০.৮৪ ৮.৩৮ মিলিয়ন হেক্টর ভূমিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। গত চার দশকে (১৯৭৩-২০০৯) দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ এলাকা এবং অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঞ্চলে প্রায় শতকরা ৬৯.৫২ ভাগ নতুন এলাকায় বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের নদীর পানিতেও বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা বিদ্যমান। মাটি ও পানির লবণাক্ততা সাধারণত নভেম্বর মাস থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং এপ্রিল-মে মাসে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছায়। এরপর বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানি প্রবাহের কারণে লবণাক্ততার মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করে। মাটি ও পানির লবণাক্ততা ফসল উৎপাদন ও সেচকার্যে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে খুব কম সংখ্যক ফসল/জাত টিকে থাকে বা সমস্ত ফসলই বিনষ্ট হয়। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে সম্ভবনাময় অনেক ফসল যেমন- দানা জাতীয়, ডাল, তৈলবীজ, শাকসব-জি ও ফল জাতীয় ফসল চাষের জন্য মাটি অনুপযোগী করে ফেলে। এমতাবস্থায়, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত ফসলের লবণাক্ততা সহনশীল জাত প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

সারণি ৪। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার শ্রেণী ও লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ

জেলা	মোট লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	লবণাক্ততার শ্রেণী ও আয়তন (হেক্টর)					গত চার দশকে লবণাক্ত এলাকা বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ (১৯৭৩-২০০৯)
		এস১ (২.০-৪.০ ডিএস/মি.)	এস২ (৪.১-৮.০ ডিএস/মি.)	এস৩ (৮.১-১২.০ ডিএস/মি.)	এস৪ (১২.১-১৬.০ ডিএস/মি.)	এস৫ (>১৬.০ ডিএস/মি.)	
বরিশাল	১২৩৬০	৯৭৫০	২৫৪০	৭০	০	০	১০০.০
পিরোজপুর	৩৫৮৩০	২৩১১০	৯৯৪০	২৭৮০	০	০	৭৬.৫০
ঝালকাঠি	৪৬২০	৩৭০০	৯২০	০	০	০	১০০.০
পটুয়াখালী	১৫৫১৮০	৫৬৭৩০	৩৯৭০০	২২৩৬০	২০৬২০	১৫৭৭০	৩৪.৮২
বরগুনা	৯৫৬২০	৩১১১০	৩০৬০০	১৬৪৭০	১২১৩০	৫৩১০	-
ভোলা	৯৪৬৭০	৪২১১০	২৮৮৪০	১০৮৫০	৯৭৭০	৩০০০	১৩৪.৫

জেলা	মোট লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	লবণাক্ততার শ্রেণী ও আয়তন (হেক্টর)					গত চার দশকে লবণাক্ত এলাকা বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ (১৯৭৩-২০০৯)
		এস১ (২.০-৪.০ ডিএস/মি.)	এস২ (৪.১-৮.০ ডিএস/মি.)	এস৩ (৮.১-১২.০ ডিএস/মি.)	এস৪ (১২.১-১৬.০ ডিএস/মি.)	এস৫ (>১৬.০ ডিএস/মি.)	
গোপালগঞ্জ	৬২৭০	৩৬৬০	৫৩০	০	০	০	১০০.০
মাদারীপুর	১২০০	৭২০	৪২০	৬০	০	০	১০০.০
খুলনা	১৪৭৯৬০	২৪৬৪০	২৬৮৮০	৩১৮০০	৩৩৯৭০	৩০৫৭০	২৩.৩
সাতক্ষীরা	১৫৩১১০	৩০০০০	৩১৯৬০	৩০৬৫০	৩১৯২০	২৮৫৮০	৪.৬২
বাগেরহাট	১৩১১২০	৩১৩৩০	৪১৩৯০	২৯৮৯০	১৯২৭০	৯২৪০	২১.৪২
মোট	**৮৩৭৯৪০**	**২৫৬৮৬০**	**২১৩৭২০**	**১৪৪৯৩০**	**১২৭৬৮০**	**৯২৪৭০**	**-**

জোয়ার বন্যা

জোয়ার বন্যা ও লবণাক্ততা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান কৃষি-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য যা এ অঞ্চলের ফসল ও শস্য পদ্ধতি এমনকি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। জোয়ার বন্যার ফলে পোল্ডারের (পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ) ভিতর ফসল রক্ষা পেলেও এর বাইরে বিভিন্ন প্রকার দাঁড়ানো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। জোয়ারের পানির কারণে রোপা আউশ ধানের সংগ্রহ পর্যায়ে এবং রোপা আমন ধানের চারা অবস্থায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। জোয়ার পানিতে ফসলের মাঠসমূহ প্লাবিত হয় এবং জমিতে জো আসতে দেরি হয়, ফলে পরবর্তী মৌসুমের ফসল সঠিক সময়ে বপন/রোপণ করা যায় না। বিশেষ করে খরিফ মৌসুমে জোয়ারের পানির কারণে ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল আবাদ করা সম্ভব হয় না। এতে করে এ অঞ্চলে ব্যাপক এলাকা পতিত থাকে, বছর-ব্যাপী ফসল শস্য পদ্ধতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং সর্বোপরি ফসলের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। ফলে এ অঞ্চলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলমগ্ন সহনশীল ফসলের জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে মাটির উর্বরতা হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ

মাঠে ফসলের গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও ভাল ফলন পাওয়ার জন্য অনুমোদিত সুষম মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকেরা সাধারণত সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেন না। এক্ষেত্রে প্রায়ই নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া জাতীয় সার অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি হারে প্রয়োগ করা হয়, তবে জৈব সার, অন্যান্য মুখ্য পুষ্টি উপাদান (যেমন- ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার) এবং গৌণ পুষ্টি উপাদান (যেমন- জিংক, বোরন, মলিবডেনাম, কপার প্রভৃতি) খুব কম পরিমাণে অথবা অনেক ক্ষেত্রে মোটেই প্রয়োগ করা হয় না। ফসলে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার না করায় মাটির গঠন নষ্ট হওয়াসহ এর উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এতে স্থায়ী ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই ধান-ভিত্তিক ফসল ধারার মাঝে ডালসহ অন্যান্য বহুবিধ ফসল (যেমন- গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, মসলা) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবাদ করলে মাটির উর্বরতা শক্তি ও পরিবেশ বজায় থাকে।

অন্যদিকে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশকের অনিরাপদ ও যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশের (মাটি, পানি ও বায়ু) দূষণ ঘটায়। বালাইনাশকের উচ্ছিটাংশ (Residues) পরিবেশে দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করতে পারে এবং তা মানুষ, পশুপাখি, মাছ, জীবজন্তু, অণুজীব ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বালাইনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পাশাপাশি ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধী/সহনশীল জাত উদ্ভাবন/ব্যবহার এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management) বা আইপিএম (IPM) কার্যক্রম (যেমন- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ, বিষটোপের ফাঁদ ও রঙ্গিন আঠালো ফাঁদের ব্যবহার, হাতজালের ব্যবহার, পোকার ডিম/ কিড়া নষ্ট করা প্রভৃতি) গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

স্বল্পকালীন শীত মৌসুম

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শীত কিছুটা দেরিতে আসে। আবার শীতের মৌসুমও শেষ হয় উত্তরাঞ্চলের বেশ আগে। অন্যদিকে দীর্ঘ জীবনকালসম্পন্ন রোপা আমন ধানের চাষ, অসময়ে বৃষ্টিপাত বা জোয়ারের পানি নামতে দেরি হলেও পরবর্তী শীতকালীন ফসল সময়মত বপন/রোপণ করা যায় না। শীতের দীর্ঘত্ব কম থাকায় সাধারণত শীতকালীন বিভিন্ন ফসল যেমন- বোরো ধান, গম, আলু, শীতকালীন শাকসবজি, সরিষা, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় অথবা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় না। ফসলের স্বল্প উৎপাদশীলতার জন্য অনেক সময় কৃষকেরা শীতকালীন ফসল উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকেন ফলে জমি পতিত থাকে। এ অবস্থায় শীতকালীন ফসলের জন্য তাপ সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় (সিডর, আইলা, মহাসেন ইত্যাদি) আঘাত হানতে দেখা যায়, যা ফসল, ভৌত-অবকাঠামো, গাছপালা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি ধ্বংস করে এমনকি মানুষের জীবনহানি ঘটিয়ে থাকে। কাজেই স্থায়ী কৃষি উৎপাদনের এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের (জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়) সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী ফসল বা জাত প্রবর্তন করা উচিত।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ফসল বিন্যাস

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর বরিশাল (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), ফরিদপুর (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও শরিয়তপুর) এবং খুলনা (খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট) অঞ্চলের ফসল বিন্যাসসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বোরো-পতিত-রোপাআমন, বোরো-পতিত-পতিত, পতিত-পতিত-রোপাআমন, পতিত-রোপাআউশ-রোপাআমন, এবং খেসারি-রোপাআউশ-রোপাআমন প্রধান প্রধান ফসল বিন্যাস হিসেবে সিংহভাগ এলাকা দখল করে আছে (সারণি ৫-১৭)। এ অবস্থায় প্রচলিত ধান-ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উন্নয়নের জন্য ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের (গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, মসলা প্রভৃতি) প্রতিকূল পরিবেশে (লবণাক্ততা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, উচ্চ/কম তাপমাত্রা, খরা প্রভৃতি) আবাদ উপযোগী/সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও বিস্তার করা আবশ্যক। এতে ফসলের বহুমুখীকরণে উন্নতি হবে ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে নিবিড় ধান চাষের কারণে ফসল হানির যে ঝুঁকি থাকে তা অনেকাংশে হ্রাস হওয়ার পাশাপাশি রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে পরিবেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সারণি ৫। বরিশাল জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ(%)
১.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৫০২৪৭	২৮
২.	শীতকালীন ফসল (ডাল-তৈলবীজ-মসলা)-আউশ-রোপাআমন	৩২৩০২	১৮
৩.	বোরো-পতিত-পতিত	২৬৯২০	১৫
৪.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	২৩৯৪৫	১৪
৫.	শীতকালীন ফসল (ডাল-তৈলবীজ-মসলা)-পতিত-রোপাআমন	২০০৯১	১১
৬.	পতিত-আউশ-রোপাআমন	১৫৪৫০	৯
৭.	অন্যান্য	৮০০০	৫
	মোট =	১৭৬৯৫৫ হে.	১০০%

সারণি ৬। পিরোজপুর জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ(%)
১.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	১৯৭৮০	২৪
২.	পতিত-রোপাআউশ-রোপাআমন	১৭৩০৭	২১
৩.	খেসারি-পতিত-রোপাআমন	৭৪১৭	৯
৪.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৬৫৯৩	৮
৫.	সবজি-সবজি-পতিত	৫৭৬৯	৭
৬.	খেসারি--রোপাআউশ-রোপাআমন	৪৯৪৫	৬
৭.	বোরো-পতিত-পতিত	৪১২১	৫
৮.	পতিত-রোপাআউশ-রোপাআমন	৩২৯৬	৪
৯.	বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন	২৪৭২	৩
১০.	সবজি-পতিত-রোপাআমন	৮২৪	১
১১.	অন্যান্য	৯৮৯০	১২
	মোট =	**৭২৫২৪ হে.**	**১০০%**

সারণি ৭। ঝালকাঠি জেলার ফসল বিন্যাস

ভূমির শ্রেণী	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ(%)
উঁচু ভূমি	সবজি-সবজি-পতিত সবজি-পতিত-রোপাআমন সরিষা-সবজি-পতিত সবজি-সবজি-সবজি কলা/আখ/পান	২৮৬১	৭
মধ্যম উঁচু ভূমি	সবজি-পতিত-রোপাআমন সরিষা-রোপাআউশ-রোপাআমন খেসারি-রোপাআউশ-রোপাআমন মুগডাল-রোপাআউশ-রোপাআমন মুগডাল-পতিত-রোপাআমন মরিচ/অন্যান্য-বীজতলা-রোপাআমন আখ সবজি-সবজি-পতিত	৩৩০০৩	৬৫
মধ্যম নিচু ভূমি	পতিত-রোপাআউশ-রোপাআমন পতিত-পতিত-রোপাআমন বোরো-পতিত-রোপাআমন বোরো-পতিত-পতিত পতিত-মিশ্রআউশ-মিশ্রআমন	১৭৮৯৫	২৮
	মোট =	**৫৩৭৫৯ হে.**	**১০০%**

সারণি ৮। পটুয়াখালী জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	৫৩৫০০	২৫.০০
২.	মুগডাল-আউশ/পতিত-রোপাআমন	৪৬১৬০	২১.৫৭
৩.	খেসারি-আউশ-রোপাআমন	২৬৫৫৭	১২.৪১
৪.	ফেলন-আউশ/পতিত-রোপাআমন	২০২৪৪	৯.৪৬
৫.	পতিত-আউশ-রোপাআমন	১৪৯৮০	৭.০০
৬.	মরিচ-পতিত-রোপাআমন	১২৫৬২	৫.৮৭
৭.	সবজি-পতিত-রোপাআমন	৮৫৬০	৪.০০
৮.	চিনাবাদাম-পতিত-রোপাআমন	৮০৬৮	৩.৭৭
৯.	তরমুজ/বাঙ্গি-আউশ/পতিত-রোপাআমন	৭৬৪০	৩.৫৭
১০.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৫৬০৭	২.৬২
১১.	মিষ্টিআলু-আউশ/পতিত-রোপাআমন	৪৩২৩	২.০২
১২.	তিল-পতিত-রোপাআমন	৩৬৫৯	১.৭১
১৩.	অন্যান্য	২১৪০	১.০০
	মোট =	২১৪০০০ হে.	১০০%

সারণি ৯। বরগুনা জেলার ফসল বিন্যাস সারণি

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	২৮৩৩৮	২৭.৪৫
২.	খেসারি-রোপাআউশ-রোপাআমন	২০৬৪৭	২০.০০
৩.	খেসারি-পতিত-রোপাআমন	১৭৬৫৩	১৭.১০
৪.	পতিত-রোপাআউশ-রোপাআমন	৭৯১৮	৭.৬৭
৫.	মুগডাল-পতিত-রোপাআমন	৬৩৪৯	৬.১৫
৬.	মুগডাল-রোপাআউশ-রোপাআমন	৫৩৪৮	৫.১৮
৭.	তরমুজ-রোপাআউশ-রোপাআমন	৩২২০	৩.১২
৮.	সবজি-রোপাআউশ-রোপাআমন	২৭২৬	২.৬৪
৯.	মরিচ-পতিত-রোপাআমন	২১৮৮	২.১২
১০.	সবজি-সবজি-রোপাআমন	২১৪৮	২.০৮
১১.	অন্যান্য-পতিত-রোপাআমন	৪৭১৮	৪.৫৭
১২.	অন্যান্য-রোপাআউশ-সবজি	১৯৮২	১.৯২
	মোট =	১০৩২৩৫ হে.	১০০%

১০। ভোলা জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন	৩৮৪৮	২
২.	মরিচ-ডিআউশ-রোপাআমন	২৩০৮৫	১২
৩.	মুগডাল-পতিত-রোপাআমন	২৮৮৫৬	১৫
৪.	মুগডাল-ডি-আউশ-রোপাআমন	২৩০৮৫	১২
৫.	ফেলন-ডি-আউশ-রোপাআমন	৩৮৪৮	২

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
৬.	খেসারি-ডি-আউশ-রোপাআমন	১৩৪৬৬	৭
৭.	চিনাবাদাম-পতিত-রোপাআমন	১৯২৪	১
৮.	মিষ্টিআলু-পতিত-রোপাআমন	৩৮৪৮	২
৯.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৩৪৬২৮	১৮
১০.	গম-ডি-আউশ-রোপাআমন	১৯২৪	১
১১.	আলু-ডি-আউশ-রোপাআমন	১৯২৪	১
১২.	অন্যান্য	৫১৯৪১	২৭
	মোট =	১৯২৩৭৫ হে.	১০০%

সারণি ১১। গোপালগঞ্জ জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	বোরো-পতিত-পতিত	৪৫৮২৯	৪২
২.	বোরা-পতিত-বোনাআমন	১৯৬৪০	১৮
৩.	বোরো-পাট-পতিত	৮৭২৯	৮
৪.	ডাল/তৈলবীজ-পাট-পতিত	৬৫৪৭	৬
৫.	ডাল/তৈলবীজ-বোনাআউশ/বোনাআমন (মিশ্র)	৪৩৬৫	৪
৬.	ডাল/তৈলবীজ-বোনাআমন-বোনাআমন	৪৩৬৫	৪
৭.	ডাল/তৈলবীজ-তৈলবীজ-রোপাআমন	৩২৭৪	৩
৮.	গম-পাট-রোপাআমন	২১৮৩	২
৯.	গম-পাট-পতিত	২১৮৩	২
১০.	সবজি-সবজি-সবজি	২১৮৩	২
১১.	পেঁয়াজ/রসুন-পাট-পতিত	১০৯১	১
১২.	ডাল/তৈলবীজ + আখ-আখ	১০৯১	১
১৩.	সবজি-পাট-রোপাআমন	১০৯১	১
১৪.	তরমুজ/বাঙ্গি-পাট-পতিত	১০৯১	১
১৫.	মসলা-পাট-পতিত	১০৯১	১
১৬.	অন্যান্য	৪৩৬৫	৪
	মোট =	১০৯১১৮ হে.	১০০%

সারণি ১২। ফরিদপুর জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	ডাল-পাট-বোনাআমন	১৮৬২১	১৩
২.	গম-পাট-রোপাআমন	১৫৫০৩	১১
৩.	বোরো-পতিত-পতিত	১৪৪০০	১০
৪.	গম-পতিত-বোনাআমন	১৪৪২০	১০
৫.	পেঁয়াজ-পাট-রোপাআমন	১৩৭৫০	১০
৬.	সরিষা-পাট-পতিত	৮২৩০	৬
৭.	তৈলবীজ-পাট-রোপাআমন	৮৫৪০	৬
৮.	ডাল-পাট-রোপাআমন	৭৯৮০	৫

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
৯.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৫৮৮০	৪
১০.	পেঁয়াজ-পাট-পতিত	৫৭৮০	৪
১১.	আখ-আখ-আখ	৪০১৭	৩
১২.	বোরো-পতিত-বোনাআমন	৪০০০	৩
১৩.	সবজি-সবজি-সবজি	৪৭৩৬	৩
১৪.	অন্যান্য	১৭৩৬৩	১২
	মোট =	১৪৩২২০ হে.	১০০%

সারণি ১৩। মাদারীপুর জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	বোরো-পতিত-পতিত	১৪৩০৬	১৭.০০
২.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১৩৪৬৫	১৬.০০
৩.	বোরো-বোনাআমন-পতিত	১২৬২৩	১৫.০০
৪.	মসুর/খেসারি-পাট/মেস্তা-পতিত	৮৪১৫	১০.০০
৫.	গম-পাট/মেস্তা-পতিত	৭৫৭৫	৯.০০
৬.	সরিষা-পাট/মেস্তা-রোপআমন	৩৪৭৬	৪.১৩
৭.	গম-পাট/মেস্তা-রোপাআমন	৩৩৮০	৪.০২
৮.	পেঁয়াজ/রসুন-পাট-পতিত	৩৩০২	৩.৯২
৯.	সরিষা-বোরো-পতিত	২৫৩০	৩.০১
১০.	সরিষা-বোনাআমন/আউশ-পতিত	২৪৫৫	২.৯২
১১.	সবজি-পাট-সবজি	২৪২৫	২.৮৮
১২.	মসুর/খেসারি-আউশ-রোপাআমন	২৪২৫	২.৮৮
১৩.	বোরো-পতিত-মাসকলাই	১৭৮৪	২.১২
১৪.	ধনিয়া-আউশ/বোনাআমন-পতিত	১৬৯৫	২.০১
১৫.	সরিষা-বোরো-রোপাআমন	১৬৮৮	২.০১
১৬.	আখ-আখ-আখ	১২০২	১.৪৩
১৬.	সরিষা-মুগডাল-রোপাআমন	১১২৮	১.৩৪
১৭.	পান-পান-পান	২৮০	০.৩৩
	মোট =	৮৪১৫৪ হে.	১০০%

সারণি ১৪। রাজবাড়ী জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	ডাল/তৈল/মসলা ফসল-পাট/তিল-রোপাআমন	১৫৭৮৯	২০.২০
২.	গম-পাট-রোপাআমন	১৫২৮২	১৯.৫৫
৩.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	৮৬২০	১১.০৩
৪.	পেঁয়াজ/রসুন-পাট-পতিত	৭১৩০	৯.১২
৫.	ডাল/তৈল/মসলা ফসল-পাট/আউশ-পতিত	৬৫০০	৮.৩২
৬.	বোরো-পতিত-পতিত	৪৯২০	৬.২৯
৭.	গম-পাট-পতিত	৩৮৫০	৪.৯৩

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
৮.	সবজি-সবজি-সবজি	৩১০০	৩.৯৭
৯.	বোরো-পতিত-বোনাআমন	২৮১৫	৩.৬০
১০.	মসলা ফসল-পাট-পতিত	২৫০০	৩.২০
১১.	ডাল/তৈলবীজ ফসল-বোনাআউশ-বোনাআমন	১৯৫০	২.৫০
১২.	সবজি-পতিত-রোপাআমন	১৫০০	১.৯২
১৩.	ডাল/তৈলবীজ-হলুদ-হলুদ	১৫০০	১.৯২
১৪.	ডাল/তৈলবীজ-বোনাআমন-বোনাআমন	১০০০	১.২৮
১৫.	ডাল/তৈলবীজ-আখ-আখ	৯৫০	১.২২
১৬.	চীনাবাদাম-পতিত-পতিত	৬৫০	০.৮৩
১৭.	তরমুজ/ফুটি-পাট-পতিত	১০০	০.১২
	মোট =	**৭৮১৫৬ হে.**	**১০০%**

সারণি ১৫। শরিয়তপুর জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	বোরো-পতিত-পতিত	১৮১৮০	২১.৩৫
২.	বোরো-পতিত-বোনাআমন	১০৪০০	১২.২২
৩.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	২৩৫০	২.৭৬
৪.	ডাল-সবজি/পাট/আউশ-রোপাআমন/পতিত	১২০৩৮	১৪.১৪
৫.	তৈলবীজ/বোরো-আউশ/পাট/বোনাআমন-পতিত/রোপাআমন/ বোনাআমন	৯৭৪৪	১১.৪৫
৬.	মসলা-আউশ/পাট/বোনাআমন-পতিত/রোপাআমন/বোনাআমন	৯৮৮৫	১১.৬১
৭.	গম-পাট-রোপাআমন	৩৯৫৮	৪.৬৫
৮.	মরিচ-ধৈঞ্চা/পতিত-ধৈঞ্চা/পতিত	৯৬৮৬	১১.৩৮
৯.	আলু-পাট-রোপাআমন/পতিত	৩২২০	৩.৭৮
১০.	সবজি-সবজি/ধৈঞ্চা-সবজি/পতিত	৪৭৯০	৫.৬৩
১১.	আখ-আখ-আখ	৮৮৬	১.০৪
	মোট =	**৮৫১৩৭ হে.**	**১০০%**

সারণি ১৬। খুলনা জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	২৩৫১১	১৮.৭৫
২.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১৬৯০১	১৩.৪৮
৩.	বোরো-মাছ-মাছ	২০১২০	১৬.০৪
৪.	পতিত-মাছ-রোপাআমন	২৭৩৫২	২৩.৮১
৫.	মাছ-মাছ-রোপাআমন	১৭০০	১.৩৬
৬.	পতিত-তিল-রোপাআমন	৯৬৪৬	৭.৬৯
৭.	পতিত-তিল+মুগডাল-রোপাআমন	১০১৫	০.৮১
৮.	পতিত-মুগডাল-রোপাআমন	২৭০	০.২১
৯.	বোরো-পতিত-বোনাআমন	৬৬৫	০.৫৩

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১০.	পতিত-মিশ্রআউশ-বোনাআমন	১০০০	০.৮০
১১.	বোরো-আউশ-রোপাআমন	৭২৪	০.৫৮
১২.	বোরো-আউশ-পতিত	১৮৯৬	১.৫১
১৩.	পতিত-আউশ-রোপাআমন	৫০০	০.৪০
১৪.	বোরো-পাট-রোপাআমন	৬২১	০.৫০
১৫.	পতিত-পাট-রোপাআমন	১৭২৪	১.৩৭
১৬.	বোরো-পতিত-মাছ	১৪০০	১.১২
১৭.	বোরো-পতিত-পতিত	৩৮৭৯	৩.০৯
১৮.	গম/আলু-পতিত-রোপাআমন	৮৪৫	০.৬৭
১৯.	তরমুজ-পতিত-রোপাআমন	৩৪০৩	২.৭১
২০.	সবজি-সবজি-সবজি	৩৭৭৫	৩.০১
২১.	সবজি-পতিত-রোপাআমন	১২২৮	০.৯৮
২২.	অন্যান্য	৭২৭	০.৫৮
	মোট =	১২২৯০২ হে.	১০০%

সারণি ১৭। সাতক্ষীরা জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১.	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১০১৮৫৮	৫৪
২.	পতিত-পতিত-রোপাআমন	৩৯৬১১	২১
৩.	বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন	১১৩১৮	৬
৪.	সরিষা-বোরো-রোপাআমন	৯৪৩১	৫
৫.	সবজি-সবজি-সবজি	৯৪৩১	৫
৬.	ডাল-পাট-রোপাআমন	৩৭৭৩	২
৭.	আলু-পাট-রোপাআমন	১৮৮৬	১
৮.	অন্যান্য	১১৩১৮	৬
	মোট =	১৮৮৬২৬ হে.	১০০%

সারণি ১৮। বাগেরহাট জেলার ফসল বিন্যাস

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১	পতিত-পতিত-রোপাআমন	৪৩২৫০	৩২
২	বোরো-পতিত-পতিত	২৬৫০০	২০
৩	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১৩৯০০	১০
৪	তৈলবীজ/মরিচ-পতিত-রোপাআমন	২২৫০	২
৫	ডাল-পতিত-রোপাআমন	৫১৯০	৪
৬	বোরো-বোনাআমন-বোনাআমন	২৩৮০	২
৭	পতিত-আউশ-রোপাআমন	৪৫৪০	৪
৮	সবজি-পতিত-রোপাআমন	১১৪০	১
৯	সবজি-পতিত-সবজি	১০০০	১

ক্রমিক	ফসল বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (%)
১০	সবজি-সবজি-সবজি	২৪৭০	২
১১	বোরো-আউশ-পতিত	৪৩৪০	৩
১২	আখ + ডাল (মিশ্র)	৮০০	১
১৩	পান-পান-পান	১৫৪৫	১
১৪	কলা-মিষ্টিআলু-হলুদ (মিশ্র)	২২০০	২
১৫	ডাল-আউশ-পতিত	১৮৭০	১
১৬	অন্যান্য	১৮৯২২	১৪
	মোট =	১৩২২৯৭ হে.	১০০%

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমি

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর বরিশাল (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), ফরিদপুর (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও শরিয়তপুর) এবং খুলনা (খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট) জেলার ফসল বিন্যাসসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মোট আবাদযোগ্য জমির একটি বড় অংশ বিভিন্ন মৌসুমে (রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২) পতিত থাকে যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বড় বাধা (সারণি ১৯)। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ফসল বিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বরিশাল অঞ্চলে (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা জেলা) মোট পতিত জমির পরিমাণ হচ্ছে ৭১৭১৬০ হেক্টর (রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমসমূহে যথাক্রমে ২০৮৪২৮, ৪৬৩৪৮০ এবং ৫৩৬৫১ হেক্টর) যা মোট আবাদযোগ্য ভূমির প্রায় ৩১%। অন্যদিকে ফরিদপুর অঞ্চলে (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও শরিয়তপুর জেলা) মোট ৪১৪৫৫৬ হেক্টর (২৮.০৯%) এবং খুলনা অঞ্চলে (খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা) ৩৪৮৮৯৩ হেক্টর (৩৮.৮৩%) জমি বিভিন্ন মৌসুমে পতিত থাকে। আবাদযোগ্য জমি পতিত থাকার প্রধান কারণগুলির মধ্যে মাটি ও পানির লবণাক্ততা, প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যা বা জোয়ারের পানি দ্বারা ফসলের মাঠ প্লাবিত হওয়া, খরা, সেচ কার্যের জন্য উপযুক্ত পানির অভাব, ফসলের উপযুক্ত জাত বা অংশ প্রযুক্তির (Component technology) অভাব, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের অভাব, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব এবং ফসলের উপযুক্ত জাত/প্রযুক্তির অভাব, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষকদের জ্ঞানের অভাব অন্যতম। এ অবস্থায়, এ অঞ্চলের প্রচলিত ফসলধারার উন্নয়ন তথা জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নের জন্য পরিবর্তিত জলবায়ুর উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এর সম্প্রসারণ করা অত্যাবশ্যক।

সারণি ১৯। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমির পরিমাণ

জেলা	মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমি (হেক্টর)				মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমি (%)			
	রবি	খরিফ১	খরিফ২	মোট	রবি	খরিফ১	খরিফ২	মোট
বরিশাল অঞ্চল								
বরিশাল	৪১১৫৫	১২৬৬৪৩	২৮১২০	১৮৭৫১৮	২৩.২৬	৭১.৫৭	১৫.৮৯	৩৬.৯১
পিরোজপুর	৪৫৯২১	৪৩৯৭৭	১১২৭৫	১০১১৭৩	৬৩.৩২	৬০.৬৪	১৫.৫৫	৪৬.৫০
ঝালকাঠি	১০৭৩৭	১৯৫৬০	৮৮৪৯	৩৯১৪৬	১৯.৯৭	৩৬.৩৮	১৬.৪৬	২৪.২৭
পটুয়াখালী	৬৯১৬৫	১২৬১০০	২১৪	১৯৫৪৭৯	৩২.৩২	৫৮.৯৩	০.১০	৩০.৪৫
বরগুনা	৩৬২৫৬	৫৯২৪৬	০	৯৫৫০২	৩৫.১২	৫৭.৩৯	০.০০	৩০.৮৪
ভোলা	৫১৯৪	৮৭৯৫৫	৫১৯৪	৯৮৩৪৩	২.৭০	৪৫.৭২	২.৭০	১৭.০৪
গড়	৩৪৭৩৮	৭৭২৪৭	৮৯৪২	১১৯৫২৭	২৯.৪৫	৫৫.১০	৮.৪৫	৩১.০০
মোট	২০৮৪২৮	৪৬৩৪৮০	৫৩৬৫১	৭১৭১৬০	-	-	-	-

জেলা	মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমি (হেক্টর)				মৌসুম-ভিত্তিক পতিত জমি (%)			
	রবি	খরিফ১	খরিফ২	মোট	রবি	খরিফ১	খরিফ২	মোট
ফরিদপুর অঞ্চল								
গোপালগঞ্জ	-	৬৮০৮৮	৬৯২২৪	১৩৭৩১২	-	৬২.৪০	৬৩.৪৪	৪১.৯৫
ফরিদপুর	-	৪৩৩৮৮	৩১৮৮৩	৭৫২৭১	-	৩০.২৯	২২.২৬	১৭.৫২
মাদারীপুর	-	৪২১৭৮	৪০২৭৮	৮২৪৫৬	-	৫০.১২	৪৭.৮৬	৩২.৬৬
শরিয়তপুর	-	৩৫৭৭৩	৩৯৫৯০	৭৫৩৬৩	-	৪২.০২	৪৬.৫০	২৯.৫১
গড়	-	৪৭৩৫৭	৪৫২৪৪	৯২৬০০	-	৪৬.২১	৪৫.০২	৩০.৪১
মোট	-	১৮৯৪২৭	১৮০৯৭৪	৩৭০৪০১				
খুলনা অঞ্চল								
খুলনা	৬৫৩৯৬	৫২১৩৭	৫৮১১	১২৩৩৪৪	৫২.৯০	৪২.১৭	৪.৭০	৩৩.২৬
সাতক্ষীরা	৪১৮৭৫	১৪৫৯৯৭	-	১৮৭৮৭২	২২.২০	৭৭.৪০	০.০০	৩৩.২০
বাগেরহাট	১১৩৫২	১৫৩৮৫	১০৯৪১	৩৭৬৭৮	৪১.২৭	৮০.৪৮	২৮.৩০	৫০.০২
গড়	৩৯৫৪১	৭১১৭৩	৫৫৮৪	১১৬২৯৮	৩৮.৭৯	৬৬.৬৯	১১.০০	৩৮.৮৩
মোট	১১৮৬২৩	২১৩৫১৯	১৬৭৫২	৩৪৮৮৯৩				

বিভিন্ন ফসলের আধুনিক/উন্নত/স্থানীয় জাত

বাংলাদেশে এনএআরএসভুক্ত বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের (দানাজাতীয়, ডাল, তৈলবীজ, আঁশ, শাকসবজি, মসলা প্রভৃতি) বেশ কয়েকটি আধুনিক/উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন। ফসলের এ সমস্ত জাতের মধ্যে কিছু কিছু জাত পরিবর্তিত জলবায়ু সহনশীল (সারণি ২০-২১)। অন্যদিকে জাত উদ্ভাবনের পাশাপশি নার্সভুক্ত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কৃষকগণ তাঁদের স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদ ব্যবহার করে পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী পরিবেশবান্ধব বেশ কয়েকটি সৃজনশীল কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি-২২)।

সারণি ২০। ফসলের আধুনিক/উন্নত/স্থানীয় জাতসমূহ

ফসলের নাম	আধুনিক/উন্নত/স্থানীয় জাত	বপন/রোপণকাল
বোরো ধান	উফশী ঃ ব্রি ধান২৮, ২৯, ৪৭, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৬৯, বিনাধান ৬, ৮, ১০, ১৪, ব্রি হাইব্রিড ধান১, ২, ৩	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি
	স্থানীয় ঃ ভোজন, খাটো ভোজন, চৈতা, কালি বোরো, কাজলা, শলই	মধ্য জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ
আউশ ধান	উফশী ঃ বিআর২৬, ব্রি ধান ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫৫, ৬৫	মার্চের শেষ সপ্তাহ-এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ
	স্থানীয় ঃ ভোজন, শলই, কালি বোরো, সাইট্যা, গরি সাইট্যা, কালো সাইট্যা, ধলি সাইট্যা, চেংগাই, হাসিকলমি, মানিকঝুরি, রাতুল	মধ্য এপ্রিল-মে এর প্রথম সপ্তাহ
আমন ধান	উফশী ঃ বিআর ১১, ব্রি ধান ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৬, বিনাধান ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬	মধ্য আগস্ট-সেপ্টেম্বর এর প্রথম সপ্তাহ
	স্থানীয় ঃ লাল মোটা, সাদা মোটা, কালো মোতা, দধি মোতা, শাইল গিরমি, রাজাশাইল, মনতেসওয়ার, লাল চিকন, সাদা চিকন, দুধ কলম, জইনা, লকমা, দিংগা, মানিক, মৌলতা, নাকশি মোতা, কার্তিক বালাম, বাঁশফুল	

ফসলের নাম	আধুনিক/উন্নত/স্থানীয় জাত	বপন/রোপণকাল
পাট	বিজেআরআই দেশীপাট-৫, ৬, ৭, ৮, বিজেআরআই তোষাপাট-৪, ৫, ৬	মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
গম	উফশী ঃ বারি গম-২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০	মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর প্রথম
ভুট্টা	উফশী ঃ বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১	রবি মৌসুমে অক্টোবর থেকে নভেম্বর, খরিফ মৌসুমে মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
আলু	উফশী ঃ ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল, রাজা, বারি আলু-৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬	নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ
	স্থানীয় ঃ লাল পাকরি, লাল শিল, চল্লিশা, শিল বিলাতি, দোহাজারি, আউশা	মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর
মিষ্টি আলু	উফশী ঃ বারি মিষ্টি আলু-৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩	মধ্য অক্টোবর থেকে শেষ নভেম্বর
বার্লি	উফশী ঃ বারি বার্লি-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬	নভেম্বর মাস
কাউন	উফশী ঃ বারি কাউন-২, ৩	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর
খেসারী	উফশী ঃ বারি খেসারী-১, ২, ৩, ৪, বিনাখেসারি-১	আমন কাটার ১৫-২০ দিন আগে
মসুর	উফশী ঃ বারি মসুর-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, বিনামসুর-৪, ৫, ৬, ৭	অক্টোবর শেষ থেকে নভেম্বর প্রথম
ছোলা	উফশী ঃ বারি ছোলা-৫, ৬, ৭, ৮, ৯, বিনাছোলা-৫, ৬, ৭, ৮	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর
ফেলন	উফশী ঃ বারি ফেলন-১, ২	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর
মাসকলাই	উফশী ঃ বারি মাস-১, ২, ৩, বিনামাস-১	ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে মধ্য মার্চ
মুগডাল	উফশী ঃ বারিমুগ-৩, ৪, ৫, ৬, বিনামুগ-৫, ৬, ৭, ৮	মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি
সরিষা	উফশী ঃ বারি সরিষা-১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭,বিনাসরিষা-৭, ৮, ৯, ১০	অক্টোবর থেকে নভেম্বর
তিল	উফশী ঃ বারি তিল-২, ৩, ৪, বিনাতিল-১, ২, ৩	মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল
সূর্যমুখী	উফশী ঃ বারি সূর্যমুখী-২	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর
চিনাবাদাম	উফশী ঃ বারি চিনাবাদাম-৬, ৭, ৮, ৯, বিনাচিনাবাদাম-৪, ৫, ৬	মধ্য অক্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর
সয়াবিন	উফশী ঃ বারি সয়াবিন-৫, ৬, বিনাসয়াবিন-১, ২, ৩, ৪	মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি
টমেটো	মানিক, রতন, বারি টমেটো-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, বিনাটমেটো-৬, ৭, ৮, ৯, ১০	শীতকালে অক্টোবর থেকে নভেম্বর এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল থেকে জুন
বেগুন	উফশী/উন্নত ঃ বারি বেগুন-১ (উত্তরা), ২ (তারাপুরি), ৩ (শুকতারা), ৪ (কাজলা), ৫ (নয়নতারা), ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, বারি হাইব্রিড বেগুন-৩, ৪, বারি বিটি বেগুন-১, ২, ৩, ৪, শিংনাথ ৬৬৬, ইসলামপুরি, খটখটিয়া, দোহাজারি	রবি ও খরিফ মৌসুম
মুলা	উফশী ঃ বারি মুলা-১, ২, ৩, ৪	মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর
শিম	উফশী ঃ বারি শিম-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, রিফা, ইপসা-১, ইপসা-২, স্থানীয় ঃ আশ্বিনা, রূপবান, ঘৃত কাঞ্চন, মুলাভুলি, গোয়াল গান্দা।	রবি ও খরিফ মৌসুম
লাউ	উফশী ঃ বারি লাউ-১, ২, ৩, ৪, স্থানীয় ঃ ক্ষেতলাউ	রবি ও খরিফ মৌসুম
করলা	উফশী ঃ বারি করলা-১, বারি হাইব্রিড করলা-১, গজ করলা।	রবি ও খরিফ মৌসুম

ফসলের নাম	আধুনিক/উন্নত/স্থানীয় জাত	বপন/রোপণকাল
মিষ্টি কুমড়া	উফশী ঃ বারি মিষ্টি কুমড়া-১, ২	রবি ও খরিফ মৌসুম
মরিচ	উফশী ঃ বারি মরিচ-১, ২, ৩	রবি ও খরিফ মৌসুম
পেঁয়াজ	উফশী ঃ বারি পেঁয়াজ-১, ২, ৩, ৪, ৫ স্থানীয় ঃ তাহেরপুরি, ফরিদপুরি ভাতি	রবি ও খরিফ মৌসুম
রসুন	উফশী ঃ বারি রসুন-১	মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর

সূত্র ঃ বিএআরআই (২০১৫), কৃষি ডাইরি (২০১৫)

সারণি ২১। জলবায়ু সহনশীল ফসলের জাত

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	সহনশীল জাতের নাম	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	মন্তব্য
ফসলের নাম ঃ ধান				
বন্যা (জলমগ্নতা)	ব্রি ধান৫২ (আমন)	১৪৫-১৫৫	৪.৫	দুই সপ্তাহ পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে
	ব্রি ধান৫১ (আমন)	১৪২-১৫৪	৪.০	
	বিনাধান-১১ (আমন)	১১৫-১২০	৫.০	২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে
	বিনাধান-১২ (আমন)	১২৫-১৩০	৪.৫	
মাটি ও পানির লবণাক্ততা	ব্রি ধান৬৭ (বোরো)	১৪০-১৫০	৩.৮-৭.৪	চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি এবং বৃদ্ধি পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
	ব্রি ধান৬১ (বোরো)	১৪৫-১৫০	৩.৮-৭.৪	
	ব্রি ধান৪৭ (বোরো)	১৫২	৬.০	
	ব্রি ধান৫৩ (আমন)	১২৫	৫.০	৮-১০ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
	বিনাধান-৮ (বোরো)	১৩০-১৩৫	৭.৫	১২ ডিএস/মি পর্যন্ত মাটির লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
	বিনাধান-১০(বোরো)	১২৭-১৩২	৭.৫	
খরা	ব্রি ধান৬৬ (আমন)	১১০-১১৫	৪.৫-৫.০	২০%এর কম মৃত্তিকা আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে
	ব্রি ধান৬২ (আমন)	১০০	৩.৫-৪.৫	
	ব্রি ধান৫৭ (আমন)	১০০-১০৫	৪.০-৪.৫	
	ব্রি ধান৫৬ (আমন)	১০৫-১১০	৪.৫-৫.০	
নিম্ন তাপমাত্রা	ব্রি ধান৩৬ (বোরো)	১৪০-১৪৫	৫.০-৫.৫	১৫° সে. এর কম তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে
বায়ুপ্রবাহ	বিনাধান-১৪(বোরো)	১২০-১৩০	৬.৯	হেলানো প্রতিরোধী
ফসলের নাম ঃ গম				
মাটি ও পানির লবণাক্ততা	বারি গম-২৫	১০২-১১০	৩.৬-৪.৬	৬-৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
উচ্চ তাপমাত্রা	বারি গম-২৮	১০২-১০৮	৪.০-৫.৫	তাপসহিষ্ণু ফলে আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী
	বারি গম-৩০	১০০-১০৫	৪.৫-৫.৫	
ফসলের নাম ঃ বার্লি				
খরা ও চরাঞ্চল	বারি বার্লি-৫	৯৫-৯৮	২.৫-৩.০	কম উর্বর, খরা পীড়িত ও চরাঞ্চলে চাষ উপযোগী
খরা ও লবণাক্ততা	বারি বার্লি-৬	৯৮-১০২	২.৫-২.৭	খরা পীড়িত ও চরাঞ্চলে চাষ উপযোগী ৬-৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	সহনশীল জাতের নাম	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	মন্তব্য
ফসলের নাম ঃ কাউন				
খরা ও চরাঞ্চল	বারি কাউন-২	১২০-১২৫	২.৫-৩.০	খরা সহিষ্ণু ও চরাঞ্চলে চাষ উপযোগী
	বারি কাউন-৩	১২০-১২৫	২.৫-২.৯	
ফসলের নাম ঃ আলু				
লবণাক্ততা	বারি আলু-২২	৮৫-৯৫	২৫-৩০	৬-৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
খরা	বারি আলু-১৭	৯০-৯৫	২৫-৩৫	খরা সহনশীল
	বারি আলু-১২	৮০-৮৫	২৫-৩০	কিছুটা খরা সহনশীল
উচ্চ তাপমাত্রা	বারি আলু-১২	৯০-৯৫	২৫-৩০	কিছুটা তাপ সহনশীল
ফসলের নাম ঃ মিষ্টি আলু				
খরা ও লবণাক্ততা	বারি মিষ্টি আলু-৯	১২০-১৩৫	৪০-৪৫	খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল
	বারি মিষ্টি আলু-৭	১২০-১৩০	৪০-৫০	
খরা	বারি মিষ্টি আলু-৮	১২০-১৩০	৪০-৪৫	খরা সহনশীল
লবণাক্ততা	বারি মিষ্টি আলু-৬	১২০-১৩০	৪০-৫০	লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
ফসলের নাম ঃ টমেটো				
উচ্চ তাপমাত্রা	বারি টমেটো-৪, ৫, ১০	৯৫-১০০	২০-২২	উচ্চ তাপ সহনশীল এবং গ্রীষ্মকালে চাষাবাদের উপযোগী
	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩	১১০-১২০	৩০ (গ্রীষ্ম)	
	বারি হাইব্রিড টমেটো-৪	১১০-১২০	৪০ (গ্রীষ্ম)	
	বারি হাইব্রিড টমেটো-৮	১১০-১২০	৩৫-৪০	
ফসলের নাম ঃ তিসি				
লবণাক্ততা	নীলা	১০৪-১১০	০.৯৬-১.০৬	লবণাক্ততা সহিষ্ণু
ফসলের নাম ঃ গর্জন তিল				
লবণাক্ততা	শোভা	১০০-১০৮	০.৯৩-০.৯৮	লবণাক্ততা সহিষ্ণু
ফসলের নাম ঃ কুসুমফুল				
লবণাক্ততা	বারি সেফ-১	১১২-১২৪	১.২১-১.৮৪	লবণাক্ততা সহিষ্ণু
ফসলের নাম ঃ সয়াবিন				
চরাঞ্চল, খরা ও লবণাক্ততা	বারি সয়াবিন-৬	১০০-১১০	১.৮-২.১	চরাঞ্চল, কিছুটা খরা ও লবণাক্ত পরিবেশে চাষাবাদের উপযোগী

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	সহনশীল জাতের নাম	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	মন্তব্য
ফসলের নাম ঃ আমড়া				
লবণাক্ততা	বারি আমড়া-১, ২	-	১৫-১৮	লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
ফসলের নাম ঃ নারিকেল				
লবণাক্ততা	বারি নারিকেল-১, ২	-	-	লবণাক্ত/উপকূলীয় পরিবেশে চাষাবাদের উপযোগী

সারণি ২২। পরিবর্তিত জলবায়ুর উপযোগী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্থানীয়/সৃজনশীল/লাগসই কৃষি প্রযুক্তি

প্রযুক্তি	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জলবায়ুতে অভিযোজনে প্রযুক্তির ভূমিকা
ভাসমান/ধাপ চাষ	বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ যেমন-কচুরিপানা, টোপাপানা, দুলালিলতা প্রভৃতি দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করা হয় যার উপরিস্তরে শাক-সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল এবং এগুলোর চারা উৎপাদন করা হয়। ভাসমান বেডের সুনিদিষ্ট কোন আকার নেই। এটি সাধারণত ৬০-১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৪-৫ ফুট প্রস্থ এবং ৩-৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে।	জলমগ্ন এলাকায় যেখানে স্বাভাবিকভাবে কোন ফসল করা সম্ভব হয় না সেখানে ভাসমান ধাপে সবজি/মসলা জাতীয় ফসল আবাদ করা যায়।
সর্জান/কাঁদি চাষ	সর্জান মডেলের জন্য প্রায় ২৮ মিটার লম্বা এবং ১১ মিটার চওড়া একখন্ড জমি দরকার হয় যেখানে ১০ X ২ মিটার আকারের ৫টি বেড তৈরি করতে হয়। এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝের মাটি কেটে উঁচু বেড করতে হয়। তবে বেডের উচ্চতা হবে কমপক্ষে ১ মিটার। দুই বেডের মধ্যে পরিখার আকৃতি, জমির প্রকৃতি বা বেডের উচ্চতার ওপর নির্ভর করবে।	জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বা বছরের বেশিরভাগ সময় পানি জমে থাকে এমন জমিতে সর্জান পদ্ধতিতে সহজেই সবজি ও ফলের চাষ করা যায়।
ডাইক পদ্ধতিতে সবজি চাষ	পুকুর, খাল, ডোবা, নদী, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদির ওপর জাংলা তৈরি করে তার ওপর কুমড়া বা লতাজাতীয় সবজি চাষ করা যায়।	নিচু এলাকায় সারা বছর লতাজাতীয় সবজি ফসল আবাদ করা সম্ভব।
উঁচু বেড	বর্ষা বা জোয়ারের পানি দ্বারা ফসলের মাঠ তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে উঁচু বেড তৈরি করে শাকসবজি ও অন্যান্য ফসলের আবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে বেডের উচ্চতা পানির উচ্চতার ওপর নির্ভর করবে।	উপকূলীয় এলাকায় হঠাৎ বর্ষা বা জোয়ারের পানির প্রভাব থেকে ফসল রক্ষা সম্ভব।

v

প্রযুক্তি	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জলবায়ুতে অভিযোজনে প্রযুক্তির ভূমিকা
পিট পদ্ধতি	নিচু এলাকার জমিতে উঁচু পিট (কমপক্ষে ৫০ সেমি উঁচু) তৈরি করে এর ভিতর বিভিন্ন সবজি ফসলের বীজ লাগানো হয়।	নিচু এলাকায় বর্ষা বা জোয়ারের পানি থেকে সবজি ফসলকে রক্ষা করা সম্ভব।
বেড প্ল্যান্টিং পদ্ধতিতে গমের চাষ	জমি ভালোভাবে চাষ করে পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্ল্যান্টার দ্বারা এক সঙ্গে বেড তৈরি ও সার ছিটানোর পাশাপাশি বীজ বপণ করা সম্ভব। অথবা কোদাল দিয়ে বেড তৈরি করে গম চাষ করা যায়। গম কাটার পর একই বেডে মেরামত করে মুগডাল, ভুট্টা, ধান ইত্যাদি ফসলের চাষ করে আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব।	ফসলের ফলন শতকরা ১০-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সেচের পানি শতকরা ৩০-৪০ ভাগ সাশ্রয় হয় এবং ইউরিয়া সারের উপযোগিতা বেড়ে যায়। স্থায়ী বেডের ক্ষেত্রে দু'ফসলের মাঝের সময় (Turn-around time) কমিয়ে সময়মত বীজ বপন সম্ভব।
বিনা চাষে আলু চাষ	বর্ষা বা জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার পর পরই বিনাচাষে আলু চাষ করা যায়। এতে রবি মৌসুমে সময়মত আলু চাষ করা সম্ভব হয়। তবে এতে মালচিং এর জন্য ধানের খড় বা শুকনা কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়।	জোয়ার-প্লাবন এলাকায় সময়মত আলু চাষ করা যায়, ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়।
মালচিং	উপকূল এলাকায় মাটির রস সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন মালচিং দ্রব্য যেমন- ধানের খড়, কচুরিপানা প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়। এতে মাটির রস সংরক্ষণের পাশাপাশি মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। লবণাক্ত এলাকায় রবি মৌসুমে চাষকৃত বিভিন্ন ফসল যেমন- আলু, মরিচ, টমেটো, বেগুন প্রভৃতিতে মালচিং করা যায়।	মালচিং মাটির রস সংরক্ষণের পাশাপাশি মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমাতে সহায়তা করে, ফলে ফসলের ফলন বেড়ে যায়।
এগ্রোফিশারি মিনি পুকুর	এগ্রোফিশারি মিনি পুকুরের আকার হবে ১২ মিটার X ১০ মিটার (বকচরসহ), তবে জলাশয় হবে ১০ মিটার X ৮ মিটার এবং মোট জমির পরিমাণ ২০ মিটার X ১৮ মিটার (৯ শতক)। পুকুরের পাড় হবে ৩ মিটার প্রশস্ত এবং উচ্চতা জমির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে স্বাভাবিক জোয়ারের প্লাবন থেকে কমপক্ষে এক থেকে দেড় ফুট উঁচু রাখতে হবে।	বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলে যেখানে জোয়ারের প্লাবনের কারণে সময়মত সবজি চাষ করা যায় না, সেখানে বসতবাড়ির পুকুরের পাড় ব্যবহার করে সহজেই সবজি চাষ করা সম্ভব।

প্রযুক্তি	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জলবায়ুতে অভিযোজনে প্রযুক্তির ভূমিকা
বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপী শাকসবজি চাষ	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সারাবছর নিবিড় সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। যেমন- ফরিদপুর মডেল, লেবুখালী মডেল (পটুয়াখালী)। এ মডেলগুলোতে বসতবাড়ির ৯টি স্থান চিহ্নিত করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করে সারাবছর নিবিড় সবজি ও ফল উৎপাদন সম্ভব।	বসতবাড়ির সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি কৃষক পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সবজি ও ফলের চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব।
খুলনা অঞ্চলে ঘেরের বেড়ি বাঁধে সারা বছররব্যাপী শাকসবজি চাষ	খুলনা অঞ্চলে ফসলি জমিতে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি ঘের তৈরি ও জলাবদ্ধতার কারণে ফসলি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায়, চিংড়ি চাষের জন্য তৈরিকৃত ঘেরের বেড়ি বাঁধে সারা বছররব্যাপী শাকসবজি চাষ করা যায়। দেখা গেছে ঘেরের বেড়ি বাঁধে টমেটো-গিমাকলমি ও মিষ্টি কুমড়া-করলা সবজি বিন্যাস আশানুরূপ ফলন ও লাভ প্রদান করতে সক্ষম।	ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিচু লবণাক্ত অঞ্চলে বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও ভূমি ক্ষয় রোধ হয়।
আন্তঃ/সাথি ফসল চাষ	চাষ করা যায় বা চাষযোগ্য এমন দুই বা ততোধিক ফসলের জীবনকাল, সার ও পানি ব্যবহার, আগাছা দমন, রোগ-বালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার ওপর সাথি ফসল আবাদ নির্ভর করে। উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারের পানি নামতে দেরি হলে রবি মৌসুমে পূর্ববর্তী আমন ধানের সাথে সাথি ফসল হিসেবে ডাল/তৈল/দানা/মসলা জাতীয় ফসল আবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে বিনা চাষে ডাল/তৈল/দানা ফসলের বীজ বপন করা হয়। অন্যদিকে ভুট্টার সাথে আন্তঃ/সাথি ফসল হিসেবে শাকসবজি/ডাল জাতীয় ফসল আবাদ করা সম্ভব।	আন্তঃ/সাথি ফসল চাষ করলে সময় ও জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের মোট উৎপাদন ও নিট লাভ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সময়মত বীজ বপন করায় ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস পায়।
পানিসাশ্রয়ী AWD পদ্ধতি প্রয়োগে বোরো ধান চাষ	দশ সেমি ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত পিভিসি পাইপ এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ১৫ সেমি মাটির নিচে এবং ১০ সেমি মাটির উপরে থাকে। একবার সেচ দেয়ার পর উক্ত পাইপের পানির স্তর সর্বনিম্নে নেমে গেলে আবার সেচ দিতে হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি দিলে বোরো ধান উৎপাদনে ৩-৪টি সেচ কম লাগবে। এতে সাধারণত ২০-৩০% পানি সাশ্রয় হয়। অথচ ফলন একই থাকে।	শুষ্ক মৌসুমে যেসব অঞ্চলে পানিস্বল্পতা রয়েছে সেখানে কম সেচে বোরো ধান চাষ করা যায়।

প্রযুক্তি	প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জলবায়ুতে অভিযোজনে প্রযুক্তির ভূমিকা
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	পুকুর, খাল, ডোবা, নদী, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদিতে বৃষ্টির পানি গৃহস্থালি/কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়।	উপকূলীয় এলাকায় মিঠা পানি বা সেচের পানির অভাব হলে রবি/খরিফ মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদান করে ধানসহ অন্যান্য ফসল আবাদ করা যায়।
চার ফসল ভিত্তিক ফসল ধারা	চার ফসল ভিত্তিক ধারাসমূহ যেমনঃ রোপা আমন (জাত: বিনা ধান-৭)-আলু (জাত: ডায়মন্ড)-বোরো ধান (জাত: ব্রি ধান২৮)-রোপা আউশ ধান (জাত: পারিজা); রোপা আমন (জাত: বিনা ধান-৭)-সরিষা (বারি সরিষা-১৪)-মুগডাল (বারি মুগ-৬)-রোপা আউশ ধান (জাত: পারিজা); রোপা আমন (জাত: বিনা ধান-৭)-সরিষা (বারি সরিষা-১৪)-বোরো ধান (জাত: ব্রি ধান২৮)-রোপা আউশ ধান (জাত: পারিজা)	সেচের সুবিধা সম্পন্ন উঁচু/মধ্যম উঁচু জমিতে চার ফসল ভিত্তিক ফসল ধারা আবাদ করে ফসলের মোট উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।
সেক্স ফেরোমন ফাঁদ	পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী পোকা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। ফাঁদ প্রতি ১ মিলি ফেরোমন একখন্ড তুলার টুকরায় ভিজিয়ে পানি ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সেমি নিচে একটি সরু তারের মাধ্যমে স্থাপন করতে হয়। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১৫টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। চারা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে। তবে সেক্স ফেরোমন পোকার ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে।	কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ ছাড়াই কুমড়াজাতীয় সবজি ফসলসমূহের জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথকে ধরে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বিষটোপ ও রঙ্গিন আঠালো ফাঁদ	বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার পদ্ধতি হলো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুঁটির সাহায্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে থাকে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়াজাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন রংয়ের (হলুদ, সাদা প্রভৃতি) আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।	সেক্স ফেরোমন/বিষটোপ/রঙ্গিন আঠালো ফাঁদ যৌথভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সবজির মাছি বা অন্যান্য পোকা দমন করা সম্ভব। তবে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য কুমড়াজাতীয় সবজি চাষকৃত জমির সকল কৃষককে একত্রে উক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষি উৎপাদনে সমস্যা

- ফসল উৎপাদনে পরিবর্তিত জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব যেমন- লবণাক্ততা, খরা, বন্যা, জলমগ্নতা, উচ্চ তাপমাত্রা,
- অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি।
- পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তির অভাব।
- রোগবালাই, পোকামাকড় ও আগাছা দ্বারা ফসল বিনষ্ট হওয়া।
- ফসলে সঠিক মাত্রায় সুষম সার (জৈব, রাসায়নিক, গৌণ উপাদান সহ) প্রয়োগ না করা।
- মানসম্পন্ন কৃষি গবেষণা কার্যক্রম এবং গবেষণাগারের অভাব।
- মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ (যেমন- ফসলের বীজ/চারা/কলম, জৈব/রাসায়নিক সার, পেস্টিসাইড, হরমোন ইত্যাদি) এর অভাব।
- সেচের জন্য মিষ্টি পানির অভাব।
- খুলনা অঞ্চলে ফসলের মাঠে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ।
- মাটির লবণাক্ততা হ্রাস, জোয়ারের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভাঙ্গন রোধকল্পে পোল্ডার বা বাধ নির্মাণ করা যেতে পারে।
- সহজলভ্য কৃষি ঋণের অভাব।
- ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থার অভাব।
- খামার যান্ত্রিকীকরণের অভাব।
- পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা বা সক্ষমতার অভাব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য ভবিষ্যৎ সুপারিশমালা

- জমি ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু সহনশীল (লবণাক্ততা, খরা, জোয়ার প্লাবন, জলমগ্নতা, উচ্চ তাপমাত্রা প্রভৃতি) ফসল/জাত উন্নয়ন/প্রবর্তন (স্থানীয় জাত সহ) করা।
- পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন ফসলের (দানাজাতীয়, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, মসলা প্রভৃতি) জলবায়ু সহনশীল জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত ধান-ভিত্তিক ফসল পদ্ধতির উন্নয়ন ও ফসল বহুমুখী-করণ করা।
- বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে (লবণাক্ততা, খরা, বন্যা, জলমগ্নতা, উচ্চ তাপমাত্রা, চরাঞ্চল প্রভৃতি) অভিযোজনের জন্য ফসল আবাদে স্থান-ভিত্তিক (Location-specific) কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
- গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় বা সৃজনশীল খামার পদ্ধতিসমূহের (যেমন- ভাসমান/ধাপ চাষ, সর্জান, উঁচু বেড, পিট, ডাইক পদ্ধতি) উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করা।
- শুধুমাত্র ফসল চাষের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে জীবনযাত্রার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বিত খামার পদ্ধতির (Integrated Farming Systems) প্রচলন করা (যেমন- ফসল, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় বছরব্যাপী শাকসবজি চাষ, কৃষি বনায়ন, মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি)।
- পরিবেশের সুরক্ষায় জন্য রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management) যেমন- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ, বিষটোপের ফাঁদ ও রঙ্গিন আঠালো ফাঁদের ব্যবহার, হাতজালের ব্যবহার, পোকার ডিম/কিড়া নষ্ট করা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ফসলের ফলন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে মাটিতে ফসলধারা ভিত্তিক অনুমোদিত মাত্রায় সুষম সার (জৈব, রাসায়নিক, গৌণ উপাদান সহ) প্রয়োগ করা।
- দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করার (Adaptation/ Mitigation to Climate Change) লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন অত্যাবশ্যক।

- মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ (যেমন- ফসলের বীজ/চারা/কলম, জৈব/রাসায়নিক সার, সেচের পানি, পেস্টিসাইড, হরমোন ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- মিষ্টি পানি সংরক্ষণের জন্য খাল/শাখা খাল খনন/পুনঃখনন করা।
- স্লুইসগেট ও বেড়িবাঁধ মেরামত ও পানি ব্যবহারকারী কৃষকদলের কাছে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা।
- পোল্ডারের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত মিঠাপানি ব্যবহার করে ফসলের প্রারম্ভিক খরা মোকাবিলার ব্যবস্থা করা।
- মাটির লবণাক্ততা দূর করার জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা করা।
- খুলনা অঞ্চলে ফসলের মাঠে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চিংড়ি উৎপাদন কার্যক্রম সীমিত করা।
- মাটির লবণাক্ততা হ্রাস, জোয়ারের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভাঙ্গন রোধকল্পে পোল্ডার বা বাধ নির্মাণ করা যেতে পারে।
- সহজ শর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা।
- ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
- খামার যান্ত্রিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বা সক্ষমতা গড়ে তোলা।

তথ্যপঞ্জি

বিএআরআই (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট)। ২০১৪। কৃষি প্রযুক্তি হাতবই (খন্ড ১-২), ষষ্ঠ সংস্করণ, বিএআরআই উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির বিবরণী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১।

বিআরআরআই (বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট)। ২০১২। পরিবর্তিত জলবায়ু ও ধান-ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি, পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধান ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১।

কৃষি ডাইরি। ২০১৫। কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ডিএই (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)। ২০১৩, ২০১৪। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ডিএই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

জিমান ও হোসেন। ২০০৭। উপকূলীয় এলাকায় ফসল উৎপাদনের কলাকৌশল। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা।

IWM-CEGIS (Center for Environmental and Geographic Information Services). 2007. Investigating the impact of relative sea-level rise on coastal communities and their livelihoods in Bangladesh. Research carried out by CEGIS in collaboration with the Institute of Water Modelling (IWM) funded by the UK Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA).

Khan, M.S., M.M. Rahman, R.A. Begum, M.K. Alam, A.T.M.A.I. Mondol, M.S. Islam and N. Salahin. 2008. Research experiences with problem soils of Bangladesh. Soil Science Division, BARI, Joydebpur, Gazipur. pp. 5-25.

SRDI (Soil Resource Development Institute). 2010. Saline Soils of Bangladesh. Soil Resource Development Institute, SRMAF Project, Ministry of Agriculture, Mrittika Bhaban, Krishikhamar Sarak, Farmgate, Dhaka-1215

We are now in a position where we must not only manage our crop plants, our domestic animals, our fisheries, forests and range lands, but the whole globe is in our care, ready or not, competent or not. We are affecting the atmosphere, the oceans, the forests, reinforests, deserts and even the climate. We are woefully unprepared for this awesome responsibility.

- Jack R Harlan

অষ্টম অধ্যায়

মরুময়তা, বনায়ন ও বন

(Forest Conservation for combating desertification)

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ [১]

Summary

Scarcity of water is one of the main causes of desertification. Though Bangladesh has average rainfall of about 2000 mm except Rajshahi Division where rainfall is little over 1500 mm, still rainy season is limited to May-July. Because of intensive tree plantation activities in Rajshahi Division over last few decades, the fear of desertification in Rajshahi does not exist anymore. Rivers in Rajshahi also provides water in lean period. In Chittagong Hill Tracts, having no rivers around, the only source of water for the local people is the natural forests. Due to rapid deforestation of the area, the water availability in the stream reduced significantly. Realizing the problem, the indigenous communities had been conserving small patches of common forests also called reserve, as natural forests as a sustainable source of water and natural resources. They settle around such community conserved area or reserve. There are more than 300 such community reserves, which are also under threat due to increasing population and conversion of such land into shifting cultivation land. Arannayk Foundation has been promoting conservation of such community conserved areas in Chittagong Hill Tracts to ensure sustained supply of water and avert desertification in the area. In some areas, water is distributed to village cluster using gravitational flow system. The water thus distributed is used for drinking and homestead vegetable cultivation. Highly degraded hills are restored through planting local tree species. Such restoration initiatives started conserving water within five years.

[১] নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

পানির অভাবেই মরুময়তার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মিমি এর ওপরে, শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১৫০০ মিমি এর কিছু বেশি। এ পরিমাণ বৃষ্টি যে দেশে থাকে সেখানে মরুময়তার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। আমরা অনেক সময় বৃষ্টিপাতের সাথে বনের সম্পর্ক খুঁজতে চেষ্টা করি। অনেকে বলেন, বন থাকলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। তা কতটুকু সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এটা নিশ্চিত যে, বন না থাকলে পানির প্রাপ্যতা শুধুমাত্র বৃষ্টির সময়েই থাকে, অন্য সময়ে হ্রাস পায়। আমরা এ প্রবন্ধে মরুময়তা ও বনের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশে বনের বিস্তৃতি

বাংলাদেশে বনের পরিমাণ নিয়ে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। কেউ বলে থাকেন আমাদের দেশে বনের পরিমাণ মাত্র ৬% অর্থাৎ সারা দেশের মাত্র ৬ ভাগ এলাকায় বন রয়েছে। কেউ বলেন ১০ ভাগ, আবার কেউ বলেন ১৭.৫ ভাগ। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) ২০০৫-২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বন জরিপ করে এর ফলাফল একটি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশের বন ও অন্যান্য সকল জায়গাতে যে বন রয়েছে, তা সব মিলিয়ে হিসাব করলে এ দেশে এখনও প্রায় ১১ শতাংশ বন রয়েছে। তবে বনের প্রকারভেদে গাছের পরিমাণ কোথাও বেশি কোথাও কম। সরকারি হিসেবে আমাদের বনভূমির পরিমাণ মোট বনভূমির প্রায় ১৭.৫ ভাগ।

জীববৈচিত্র্য ও বননিধন

বাংলাদেশ ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। সরকারি বনে অনেক দরিদ্র মানুষ বাড়িঘর তৈরি করে বসবাস করছেন। আবার অনেকে কিছুটা বন পরিষ্কার করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করে আবাদ করছেন। শুধু দরিদ্র মানুষ নয়, অনেক সময় দেখা যায় ধনী ও ক্ষমতাবান লোকেরা বনের জমি দখল করে কলকারখানা তৈরি করছেন। সরকারও কোন কোন বনে রাবার বাগান বা গাছ লাগানোর জন্য বন সাধারণ মানুষকে ইজারা বা বরাদ্দ দিয়েছে। ফলে আমাদের বনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। রাবার হোক বা ফল জাতীয় গাছ হোক, যে কোন জমিতে যদি দীর্ঘমেয়াদি গাছ থাকে তা একদিকে যেমন ভূমির ক্ষয়রোধের জন্য ভালো অন্যদিকে পানির প্রাপ্যতার জন্যও ভালো। কিন্তু আমাদের সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। দরিদ্র থেকে ক্ষমতাবান ব্যক্তি পর্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। তাই সরকারি বনে দামি গাছ-পালা পেলেই তাদের নজর কাড়ে, আর চেষ্টা করে কত দ্রুত এ গাছটি কেটে কাড়ি কাড়ি টাকা পাওয়া যাবে। এতে সাধারণ মানুষের বা বনের বন্যপ্রাণীর কী ক্ষতি হবে তা আমরা অনেক সময় বিবেচনায় আনি না। ফলে বাংলাদেশের বনসমূহের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধীরে ধীরে হুমকির মুখে পড়েছে। আমাদের দেশে বনাঞ্চল বলতে বোঝায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি বন, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নওগা, রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও এর সমতল ভূমির শালবন এবং সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার ধ্বংসপ্রাপ্ত জলজ বন। বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। দেশের সব জেলায় বন নেই। সুন্দরবন ছাড়া বাকি সব বনে বননিধন চলছে। সব চাইতে খারাপ অবস্থায় রয়েছে জলজ বন, যেখানে এক সময়ে প্রচুর হিজল করচের বন ছিল। শুধুমাত্র ইজারা পদ্ধতির কারণে এ বন আজ প্রায় বিলুপ্ত। জলজ বনের পর সব চাইতে বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে সমতল ভূমির শালবন। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের শাল বনের অনেক জমি ক্ষমতাশীল ব্যক্তির দখলে চলে গেছে। তারা সেখানে কলকারখানা তৈরি করেছেন। অনেকে এ বনের অনেক জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করেছেন।

বৃষ্টিপাত ও মরুময়তা

রাজশাহী বিভাগে এমনিতেই বৃষ্টির পরিমাণ কম। তার ওপর আবার বনের পরিমাণও কম এবং যা আছে তাও ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। ফলে রাজশাহী বিভাগে পানির প্রাপ্যতা দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় কম। রাজশাহী বিভাগের তাপমাত্রাও অনেক বেশি। তাই আমরা অনেকে রাজশাহী বিভাগে মরুময়তা দেখা দিচ্ছে বলে মনে করি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে

সরকারি-বেসরকারি সংস্থা মিলে রাজশাহী বিভাগে বসতবাড়িসহ সম্ভাব্য সকল স্থানে গাছ লাগানোর ফলে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণে অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক জমিতে আম ও লিচুর বাগান হয়েছে। গাছের আবরণ মাটিকে কিছুটা আচ্ছাদিত করে রাখে বলে রাজশাহী বিভাগে আগের মত গ্রীষ্মের গরম নেই। তাছাড়া, রাজশাহী বিভাগে কিছু নদ-নদীও আছে। ফলে আমাদের মধ্যে রাজশাহীতে মরুময়তার যে শঙ্কা বিরাজ করছিল তা ক্রমে কমে আসছে।

পক্ষান্তরে পাহাড়ি বনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন নদ-নদী নেই। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে পাহাড় কেটে কাপ্তাই লেক করা হয়েছিল জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। পাহাড়ের মাটি ক্ষয়ে তাও প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে লেকে যথেষ্ট পানি পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে হয়ত তার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করার চেষ্টা করে থাকেন। বাস্তবে এর মূল কারণ হলো বননিধন। পাহাড়ি বনের বৃক্ষনিধন এত বেশি হয়েছে যে, সেখানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসমূহ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। একসময় এ বনে বাঘ ছিল। আজ এসব বনে কিছু বানর ও শূকর ছাড়া অন্য কোন বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। বনের গাছপালা কমে যাওয়ায় হাতিসহ সকল বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশি। যেহেতু সেখানে কোন নদী নেই, তাই বৃষ্টির পানির ওপরই তাদের জীবন নির্ভরশীল। বৃষ্টির দিনে তাদের পানির কোন অভাব হয় না। কিন্তু বর্ষার পর পরই পানির জন্য তারা হিমসিম খেতে থাকে। এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘন বনাঞ্চল ছিল। বন ধ্বংসের পর থেকে বর্ষা মৌসুমের পর পরই ঝিরি বা ছড়া শুকিয়ে যায়। ফলে তারা পানীয় জলের জন্য দূর-দূরান্তে ছুটতে থাকে। অর্থাৎ বননিধনের কুফল পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি অনুভব করছে। যদিও বা সাধারণ মানুষ জানে বননিধনের ফলেই ঝিরিতে পানি থাকছে না, তবুও পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য কোন বড় ধরনের সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত নেয়া হয়নি। তবে সাধারণ মানুষ তাদের প্রথাগত জ্ঞান দিয়ে পানির চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে। স্থানীয় জনগণ সেখানেই বসতি স্থাপন করে যেখানে একখন্ড প্রাকৃতিক বন রয়েছে। তারা জানে প্রাকৃতিক বন পানির আধার। তাই এ ধরনের বন তারা সংরক্ষণ করে এবং এ বন ব্যবস্থাপনার জন্য এলাকার স্থানীয় নেতা যারা হেডম্যান (মৌজার ক্ষেত্রে) বা কারবারি নামে পরিচিত, তাঁরা এ বন ব্যবস্থাপন-ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোন গাছ বা বাঁশ কাটা যায় না। শুধুমাত্র নিজ বাড়িতে ব্যবহারের জন্য গাছ বা বাঁশ হেডম্যান বা কারবারির অনুমতি নিয়ে বছরে একবার কাটতে পারে। এধরনের ছোট ছোট প্রাকৃতিক বনকে স্থানীয় ভাষায় রিজার্ভ বা পাড়া বন বা মৌজা বন বলা হয়ে থাকে। আইনের ভাষায় এ বনকে ভিলেজ কমন ফরেস্ট বা ভিসিএফ বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের প্রায় ৩০০ বন রয়েছে বলে জানা যায়। এ ধরনের এক একটি রিজার্ভ আয়তনে গড়ে ৫০ থেকে ১০০ একর। তবে কোন কোন মৌজা বনের আয়তন ১০০০ একরেরও বেশি। এসব বনে নানা ধরনের জানাঅজানা গাছ থাকে। এখানে প্রায় সব ধরনের বন্যপ্রাণীও পাওয়া যায়। তবে সবাই বলছে যে, এ বনে কোন বাঘ নেই, কদাচিৎ ভালুক দেখা যায়।

বন সংরক্ষণে আরণ্যক ফাউন্ডেশন

আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল থেকে এ ধরনের বন সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণকে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। সম্প্রতি ইউএনডিপি ও একটি বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে এ ধরনের মৌজা বন বা পাড়া বন সংরক্ষণের জন্য মূলত এ ধরনের পাড়া বা মৌজা বন পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পানির উৎস। ছোট ছোট এ মৌজা বা পাড়া বন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়াটারশেড হিসেবে কাজ করছে। এ ধরনের বনের পাশে যে ঝিরি বা ছড়া রয়েছে তাতে প্রায় সারা বছরই পানি থাকে। আরণ্যক ফাউন্ডেশন এ ধরনের বনের পানি বিদ্যুৎ-বিহীন পন্থায় পাড়ায় বসবাসকারী পরিবারগুলোতে পাইপের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে বিশেষ ব্যবস্থাও নিয়েছে। স্থানীয় জনগণ এ পদ্ধতিকে জিএফসি বা গ্রেভিটেশনাল ফ্লো সিস্টেম বলে থাকে। ফলে এখন যে সব এলাকায় জিএফএস আছে, সে এলাকার মানুষকে বনে বা ঝিরিতে পানির জন্য আর দৌড়াতে হয় না। এ পানি তারা পান করে এবং শাক-সবজি উৎপাদনে ব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ১৩৫টি ন্যাড়া পাহাড়ে প্রায় ২০০ পরিবারকে পরিবেশসম্মতভাবে বসবাস করার এবং বন পুনরুদ্ধার করার সহায়তা দানের লক্ষ্যে ন্যাড়া পাহাড়ে কৃষি বনায়ন প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০০৯ সালে আনন্দ নামক একটি এনজিও-এর তত্ত্বাবধানে দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাহাড়ের পাদদেশে ফল ও কাঠের মিশ্র বাগান এবং পাহাড়ের মধ্যম ও চূড়ায় হাজার হাজার চম্পা, গর্জন ও চাপালিশ গাছ লাগানোর ফলে মাত্র পাঁচ বছরে এসব পাহাড় সম্পূর্ণ বৃক্ষাচ্ছাদিত হয়ে গেছে। যেহেতু, প্রায় সব স্থানে একাধিক প্রজাতির বৃক্ষ ও নানা উচ্চতার গাছ বা উদ্ভিদ লাগানো হয়েছে, তাই সেখানে এক ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সেখান থেকে ঝিরিতে পানি প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ অনেক হরিণ ও শূকর দেখতে পাচ্ছে বলেও জানাচ্ছে। নানা ধরনের পাখি দেখা যাচ্ছে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে ন্যাড়া পাহাড়কে স্থানীয় গাছ-পালা ও গুল্ম দ্বারা আবৃত করা যায় তবে অতি অল্প সময়ে ন্যাড়া পাহাড়কে প্রাকৃতিক বনে রূপান্তর করা সম্ভব। এসব বন থেকে বর্ষার পরেও কিছু সময় ধরে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

রাঙ্গামাটির কুতুকছড়ি নামক স্থানের একটি মন্দির রয়েছে যেখানে একজন ভান্তে বা ধর্মযাজক রয়েছেন। তিনি বৃক্ষপ্রেমী। বিগত ১০ বছরে তিনি তাঁর এলাকার প্রায় ১০০ একর জমিতে ১০০ ধরনের স্থানীয় বৃক্ষ লাগিয়েছেন। এই এলাকা বর্তমানে সম্পূর্ণ বৃক্ষাবৃত। তবুও তাঁর লাগানো গাছ থেকে আজও তিনি পানির প্রবাহ তৈরি করতে পারেন নি। হয়তো আরও কয়েক দশক লাগবে তাঁর লাগানো বৃক্ষাবৃত এলাকাটিকে প্রাকৃতিক বাগানের মতো পানির প্রবাহ সৃষ্টি করতে। তবে তিনি জানেন যে, প্রাকৃতিক বন পানির উৎস। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে পার্শ্ববর্তী প্রাকৃতিক বনের পানির প্রবাহকে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের মত জিএফএস পদ্ধতির মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা করেছেন যা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাকৃতিক বন থেকে যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তা পাইপের মাধমে একটি বড় পানির ট্যাঙ্কে এনে নুড়ির মাধ্যমে পানি ফিল্টার করে মন্দিরে পানি নিয়ে তাঁর কাছে আসা মানুষকে তিনি পানি পরিবেশন করছেন।

চিত্র-১। প্রাকৃতিক বন যা কুতুকছড়ির পানির উৎস

চিত্র-২। প্রাকৃতিক বন থেকে পানি সরাসরি এ ট্যাঙ্কে জমা হয়

উপরিবর্ণিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বৃষ্টির পানির পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, যদি এলাকাটি পাহাড়ি এলাকা হয়, তবে বৃক্ষাবৃত না থাকলে সেখানেও মরুভূমির মতো অবস্থা হবে।

বনায়ন ও মরুময়তা

মরুময়তা রোধে আমাদের গাছ লাগাতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২০০ প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়। বনাঞ্চলে গাছের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৫০০। বন ধ্বংসের হাত থেকে পাহাড়ি বনকে রক্ষা করতে না পারলে পাহাড়ি এলাকায় অতি দ্রুত মরুময়তা দেখা দিবে। মনে রাখতে হবে, পানির জন্য বনায়নের চাইতে প্রাকৃতিক বন অধিকতর উপযোগী। তাছাড়া, বন্যপ্রাণীর জন্যও ভালো। তবে যে সব স্থানে বননিধন বেশি হয়েছে, সেখানে অবশ্যই বনায়ন করতে হবে। বনায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয় লক্ষ রাখতে হবে তা হলো স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ধরনের গাছ দিয়ে মিশ্র বনায়ন করতে হবে। এসব বন কয়েক দশক পর প্রাকৃতিক বনের রূপ ধারণ করবে এবং পানির প্রবাহ সৃষ্টি করতে বা বৃষ্টির পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

বন সংরক্ষণ বনাম গাছ কর্তন

গাছ বা বাঁশ নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। গাছ বা বাঁশ খুব বেশি বয়স হলে অবশ্যই কাটতে হবে। গাছ দিয়ে আমরা নানা ধরনের ফার্নিচার বানিয়ে থাকি। বাঁশ বাড়িঘর তৈরি থেকে কাগজের মন্ড তৈরিতেও কাজে লাগে। অতএব, বন সংরক্ষণ মানে গাছপালা বা বনজ সম্পদ আহরণ থেকে বিরত থাকা নয়। আমরা আমাদের চুল বা নখ না কাটলে আমাদের যেমন ভালো দেখায় না, তেমনি বন থেকে অধিকতর পুরানো গাছ বা বাঁশ না কাটলে বনের রূপও ভালো দেখায় না। আমাদের দেশে জ্বালানির অভাব রয়েছে। এখনও বনবাসী বা বনসংলগ্ন বসতবাড়ির মানুষ জ্বালানি কাঠের ওপরই বেশি নির্ভর করে। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অতিমাত্রায় গাছ কাটা হয় বলেই অনেক সময় বন ধ্বংস হয়। জ্বালানি কাঠের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বনের ওপর চাপ কমাতে পারি। এজন্য প্রয়োজন বন্ধুচুলা বা জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার করা। এর ফলে জ্বালানি কাঠের চাহিদা প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। তাছাড়া, এ ধরনের চুলা ব্যবহারের ফলে আমাদের মা-বোনেরা নানা রোগ থেকে বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট জাতীয় রোগ থেকে রেহাই পেতে পারে। কাজেই বন সংরক্ষণের জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

শুধুমাত্র পরিবেশের কথা ভেবে গাছ লাগালে হবে না, আমাদের প্রাকৃতিক বনে স্থানীয় গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগিয়ে প্রাকৃতিক বনের সুফল পেতে হলে মিশ্র বাগান ও বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান তৈরি করতে হবে। যেহেতু পাহাড়ি এলাকায় প্রাকৃতিক বন পানির একমাত্র উৎস, প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের জন্য তাই আমাদের সকল শ্রেণীর মানুষকে সচেতন হতে হবে। যেসব পাহাড় ইতোমধ্যে বৃক্ষ শূন্য হয়ে পড়েছে, সেখানে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগাতে হবে যাতে বনে বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়। রাজশাহী বিভাগে অধিক হারে গাছ লাগানোর ফলে ইতোমধ্যে যে ধরনের বৃক্ষাবরণ তৈরি হয়েছে তা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত রেখে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

নবম অধ্যায়

খরা ও ভূমি অবক্ষয় মোকাবেলায় জৈব সার ও জীবাণু সারের প্রয়োগ

(Application of Organic Manures and Bio-fertilizers to Combat Drought and Land Degradation)

ড. এম. এ. সাত্তার [১]

Summary

The beneficial effects of using organic manures (viz. green manure, crop residues, compost farmyard manure, city and household wastes) and bio-fertilizers (viz. Rhizobium inoculants, blue green algae, phosphate mineralizing microorganisms, compost cultures etc.) in improving the physico-chemical and organic qualities of soil have long been proven in Bangladesh, specially in drought prone area. The paper highlights the field trials of different organic resources pin-pointing the problems faced in the use and dissemination of the technologies. Inconsistent field response, lack of simple method of application, non-availability and poor quality of organic/microbial products and lack of adequate demonstration and awareness program have been identified as the major constraints in popularizing their use at farm level. Establishment of bio-fertilizer manufacturing plant, adequate dissemination and awareness program and integrated use of bio-fertilizer, organic manure and chemical fertilizer are suggested to extract maximum benefits from these technologies in the improvement of soil fertility and increased and enhanced use of drought prone area with full potential to ensure food security of the country.

[১] সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ডিএলডিডি), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা- ১২০৭।

সূচনা

বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকার প্রধান সমস্যা পানির স্বল্পতা (বছরে গড় বৃষ্টিপাত ঃ ৭০০-১১০০ মি.মি.) এবং উচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ঃ ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (কখনও ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ও শীতকালে ঃ ৯-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (কখনও ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। এমন অবস্থায় বছরের কোনো কোনো সময় বিশেষত রোপা আমনের মধ্যম/শেষ পর্যায় থেকে রবি মৌসুম (জুলাই-ডিসেম্বর) এবং মার্চ-মে সময়ে শস্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। বাধাপ্রাপ্ত হয় গোখাদ্য উৎপাদন ও মৎস্যচাষ। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মাটি হয় অনুর্বর। প্রভাবিত হয় আর্থসামাজিক অবস্থা।

বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকার আয়তন প্রায় ৮,৭২০ বর্গ কিলোমিটার যা বন্যামুক্ত। যে দেশের জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ মাত্র ৬ শতাংশ এবং যেখানে খাদ্য ঘাটতি প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পর্যবাসিত, এমন একটি দেশে বন্যামুক্ত এই এলাকা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশ দানাজাতীয় শস্য (ধান, গম ইত্যাদি) উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যথা ডাল, শাকসবজি, তেল, মসলা ইত্যাদিতে এখনো আমাদের ঘাটতি বিশাল, যা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করেই পূরণ করতে হয়। উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সকল শস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে এই অঞ্চলটিকে লাভজনক কৃষি এলাকায় রূপান্তর করা যায়।

শস্য উৎপাদনে সার ব্যবহার একটি আবশ্যকীয় বিষয়। বিশেষ করে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, দস্তা ইত্যাদি সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। নাইট্রোজেন সার যথা ইউরিয়া দেশে অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হলেও প্রায় সকল রাসায়নিক সারই বিপুল পরিমাণ কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানি করতে হয়। সারগুলোর অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটি, জলাধার ও পরিবেশ দূষণ হয়। জৈব সার যথা সবুজ সার, অর্থাৎ খামারজাত (গোবর, হাঁসমুরগির বিষ্ঠা, ছাই, খৈল) সার, প্রাণিজ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের পচনকৃত কম্পোস্ট সার এবং জীবাণুসার যথা ঃ রাইজোবিয়াম, ফসফো-ব্যাকটেরিয়া, মাইকোরাইজা, কম্পোস্ট কালচার ইত্যাদি বিভিন্নভাবে মাটির উর্বরতার উন্নয়ন ঘটায় ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি করে সারের কার্যকারিতা। জৈব সার ও জীবাণু সারের এই উপকারিতা খরাপ্রবণ এলাকায় অনেক বেশি দৃশ্যমান ।

জৈব সার

জৈব সার প্রয়োগ মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। এই উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলির দিকগুলো সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

ভৌত বৈশিষ্ট্য ঃ (১) মাটির কণা বিন্যাস উন্নত করে দলা সৃষ্টি করে; (২) মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; (৩) মাটির দৃঢ়তা শিথিল করে; (৪) ভূমি ক্ষয় ও খরা রোধে ভূমিকা রাখে; এবং (৫) মাটির তাপমাত্রা কম রাখে এবং শীতে মাটি গরম রাখে।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ঃ (১) উদ্ভিদের মুখ্য খাদ্য উপাদান যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সহ কম-বেশি সকল খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে; (২) বিয়োজিত হওয়ার পর জৈব সার মাটিতে হিউমাস বৃদ্ধি করে (হিউমাস-কে মাটির প্রাণ বলা হয়); (৩) মাটির বাফার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (অম্লতা-ক্ষারতার হ্রাস-বৃদ্ধি রোধ); (৪) রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে; (৬) আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (CEC) বৃদ্ধি করে; (৭) পচনের পর কিছু এসিড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে যা মাটি অভ্যন্তরস্থ জটিল যৌগ ভেঙ্গে পুষ্টি উপাদান যেমন ঃ ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদির প্রাপ্যতা বাড়ায়; (৮) CEC বৃদ্ধির ফলে পুষ্টির নির্গমণ (Leachlng) হ্রাস পায়।

জৈবিক বৈশিষ্ট্য ঃ (১) মৃত্তিকা অণুজীবের জন্য খাদ্য ও শক্তি সরবরাহ করে এবং অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; (২) মাটির অণুজৈবিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে পুষ্টি নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখে; (৩) মাটির

নেমাটোড ও ভারি ধাতুর/কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে; এবং (৪) মাটিতে কেঁচো, ইঁদুর, পিঁপড়া ও অন্যান্য জীবের খাদ্য সরবরাহ করায় মাটির ভিতর বায়ু চলাচলের পথ সুগম হয়।

জীবাণু সার

জীবাণু সার হচ্ছে অতি ক্ষুদ্রজীব যা খালি চোখে দেখা যায় না। বিভিন্ন আবাদ মাধ্যমে এদের জন্মানো হয় এবং সেই মাধ্যমে জীবাণুর সক্ষম উপস্থিতির সংখ্যা/ঘনত্ব (সাধারণত ১.৬/মিলিলিটার) নিশ্চিত হয়ে প্রয়োগ করা হয়। প্রধানত তিন প্রকারের জীবাণু সার কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো ঃ ১) ইউরিয়ার বিকল্প (বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী) যথা ঃ রাইজোরিয়াম, অ্যাজোস্পাইরিলাম, নীল-সবুজ-শেওলা ইত্যাদি; ২) টিএসপি'র বিকল্প (ফসফরাস অবমুক্তকারী) যথা ঃ ব্যাসিলাস, সিউডোমোনাস, মাইকোরাইজা ইত্যাদি ও (৩) জৈব পদার্থ (খড়, নাড়া, গোবর) পচনকারী যথা ঃ অ্যাসপারজি-লাস, সেলুলোমোনাস, ট্রাইকোডারমা ইত্যাদি। নাইট্রোজেন সংযোজনকারী জীবাণুগুলো ১০-৩০০ কেজি বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে মাটির উর্বরতার উন্নয়ন ও বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে পারে। বিভিন্ন জীবাণু সারের উপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) শস্যের ফলন বৃদ্ধি

ক্রমিক নং	শস্যের নাম/ জীবাণুর নাম	বৃদ্ধির হার(%)
১	রাইজোবিয়াম সার	
	মসুর	১৫-৪০
	ছোলা	২০-৪৫
	মুগবিন	১৮-৩৫
	বরবটি	২৫-৪৫
	মাষকলাই	২০-৩০
	চিনাবাদাম	২০-৪০
	ধইঞ্চা	৪০-৮০
	সয়াবিন	২০-১৫০
২	অ্যাজোটাব্যাকটার/অ্যাজোস্পাইরিলাম	৭-২৫
৩	নীল-সবুজ-শেওলা	২০-৩০
৪	অ্যাজোলা	২০-৫০
৫	ফসফোব্যাকটেরিয়া	১৫-৫০
৬	মাইকোরাইজা	১৫-৩০
৭	কম্পোস্ট কালচার	২০-৫০

খ) শস্যের আমিষ বৃদ্ধি ঘটে ঃ ২০-১৫০%।

গ) মাটিতে নাইট্রোজেন/ফসফরাস/জৈব পদার্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি উন্নত করে, ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ) রোগবালাই বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ঙ) হরমোন জাতীয় পদার্থ (ইনডোল এসেটিক এসিড, জিবারেলিন ইত্যাদি) উৎপাদন করে শস্যের বীজ অঙ্কুরোদগম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

চ) রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

ছ) মাটি, ফসল, জলাশয়, পশুসম্পদ মানবজীবন বা পরিবেশের ওপর কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না।

জ) ইউরিয়ার তুলনায় জীবাণু সারের উৎপাদন খরচ অত্যন্ত কম হওয়ায় ও পরিমাণে কম লাগায় শস্য উৎপাদনে ব্যয় কম হয়।

ঝ) দীর্ঘ সময় কার্যকর থাকে, ফলে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়া কম লাগে।

ঞ) অধিক পরিমাণ ও উন্নত মানের (উচ্চ আমিষধারী) পশুখাদ্য (ভূষি ও দানা) উৎপাদন যা প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে সহায়ক।

ট) জীবাণু সার তৈরিতে বিদ্যুৎ ও শ্রম শক্তি কম লাগে, ফলে সাশ্রয়কৃত বৈদ্যুতিক শক্তি/শ্রম দেশের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

জীবাণুর তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা

উচ্চ তাপমাত্রা জীবাণু সার প্রযুক্তির কার্যকারিতায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। সাধারণভাবে ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় সকল গ্রুপের জীবাণুর (কম্পোস্ট কালচার ব্যতীত) সর্বোচ্চ দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিম্নে গ্রুপ ভিত্তিক জীবাণু সারের কার্যকারিতার অনুকূল তাপমাত্রা দেওয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	জীবাণুর গ্রুপ	অনুকূল তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)
১	রাইজোবিয়াম	২০-৩০
২	নীল-সবুজ-শেওলা	৩০-৪০
৩	অ্যাজোলা	১৮-২৮
৪	অ্যাজোস্পাইরিলাম	৩০-৪০
৫	ফসফো-ব্যাকটেরিয়া	২০-৩০
৬	মাইকোরাইজা	২৫-৩০
৭	কম্পোস্ট কালচার	৪০-৫০

রাইজোবিয়াম জীবাণুর সর্বোচ্চ দক্ষতার শর্ত

১। মৃত্তিকার তাপমাত্রা

সবচেয়ে অনুকূল ঃ ২০-৩০° সে.

পরিসর ঃ ১২-৩২° সে.

কার্যক্রম বন্ধ ঃ < ১০° সে., >৪০° সে.।

২। মৃত্তিকার জৈব কার্বন (পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা)।

৩। পরিমিত পুষ্টির উপাদানের প্রাপ্যতা ঃ

নাইট্রোজেন ঃ অল্পমাত্রা (<২০কেজি/হেক্টর)

ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বোরন ইত্যাদির পরিমিত পরিমাণ।

৪। মৃত্তিকার আর্দ্রতা ঃ স্বাভাবিক (মধ্যম জো) অবস্থা।

৫। অম্লতা/ক্ষারত্ব ঃ পিএইচ ঃ ৫.০-৭.৫।

৬। শস্য-নির্দিষ্টতা ঃ মসুরের রাইজোবিয়াম ছোলায় কাজ করে না।

৭। সঠিক জীবাণুর পর্যাপ্ত পরিমাণ ঃ $>১০^{৬}$ গ্রাম মাটি।

জীবাণু সারের কার্যকারিতার প্রতিবন্ধকতা

জীবাণু সারগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন সরবরাহকারী ইউরিয়ার বিকল্প জীবাণু সারের প্রচলন ও ব্যবহার সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। ইউরিয়ার বিকল্প জীবাণু সারের মধ্যে রাইজোবিয়ামের ব্যবহার অন্যগুলোর চেয়ে ব্যাপক। বাংলাদেশে ইউরিয়ার বিকল্প জীবাণু সারের বেশ কয়েকটি জীবাণু নিয়ে গবেষণা হলেও কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে রাইজোবিয়াল জীবাণু সার। বরেন্দ্র তথা খরাপ্রবণ অঞ্চলে এই জীবাণু সারের ব্যবহার করতে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায় এগুলোর মধ্যে কিছু মৃত্তিকা ও পরিবেশগত সমস্যা, কিছু কারিগরি, কিছু ব্যবস্থাপনা, কিছু আর্থ-সামাজিক ও কিছু সাধারণ সমস্যা। সমস্যাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। **মৃত্তিকা ও পরিবেশগত সমস্যা ঃ** (ক) তাপমাত্রা; (খ) খরা; (গ) জলাবদ্ধতা; (ঘ) মৃত্তিকা পুষ্টির (কার্বন, ফসফরাস, বোরন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি) ঘাটতি এবং (ঙ) জৈবিক সমস্যা ঃ (১) পরজীবী ও শিকারী কীট; (২) স্থানীয় জীবাণুর সাথে পুষ্টি প্রতিযোগিতা; (৩) ঘাতক শত্রু ও বন্ধু জীবাণুর সাথে সংঘাত।

২। **ইনোকুলাম সম্পর্কীয় প্রতিবন্ধকতা ঃ** (ক) অনিয়মিত/অসামঞ্জস্য প্রভাব; (খ) স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না; (গ) সহজ ব্যবহার-পদ্ধতির অভাব; (ঘ) নিম্নমান (কার্যকর জীবাণুর ঘনত্ব/গ্রাম বাহক); (ঙ) সূর্যের আলো ও তাপমাত্রা এড়ানোর জটিলতা; (চ) জীবাণু সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা।

৩। **ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমস্যা ঃ** (ক) উপযুক্ত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যাবস্থাপনা; (খ) সম্প্রসারণ কর্মীর প্রশিক্ষণের অভাব; (গ) সকল সম্প্রসারণ কর্মীর সমন্বয়হীনতা; (ঘ) পরিবহণ সংকট; (ঙ) গণসচেতনতা কার্যক্রমের অভাব।

৪। **ডাল জাতীয় শস্য চাষে আর্থ–সামাজিক সমস্যা ঃ** (ক) লাভ ঃ খরচ অনুপাত কম; (খ) সীমিত কিছু ডালের ব্যবহার; (গ) কর্তনকালীন অল্পদাম; (ঘ) অশিক্ষা ও নিম্ন আয়ের কৃষক; (ঙ) গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মাঝে যোগাযোগ স্বল্পতা; (চ) সরকারি নীতির অভাব।

৫। **ডাল জাতীয় শস্যের চাষে সাধারণ সমস্যা ঃ** (ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের অভাব; (খ) দানা জাতীয় শস্য যথা ধান, গম, ভুট্টা শস্যের সাথে ডাল জাতীয় শস্যের চাষযোগ্য জমির প্রতিদ্বন্দ্বিতা; (গ) প্রান্তিক জমিতে চাষাবাদ; (ঘ) শিম জাতীয় শস্যের উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা; এবং (ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়া।

উপসংহার

আশেপাশের প্লাবনভূমি থেকে খরাপীড়িত বরেন্দ্রভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর অবস্থানে অবস্থিত। এই এলাকার সমুন্নতি রেখা দু'টির একটির তল ৪০ মিটার উচ্চতায় এবং অন্যটি ১৯.৮-২২.৯ মিটারের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এলাকাটি বন্যামুক্ত ও কৃষির জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গেছে গত শতকে তীব্র খরার কারণে ফসলহানি ১০% থেকে ৭০% পর্যন্ত হয়েছে। জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অতীব নিম্ন। নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও নিম্ন থেকে মধ্যম পরিমাণে বিদ্যমান। আর এ ঘাটতি পূরণ করা অত্যাবশ্যক।

ইতঃপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে যে, জৈব সার ও জীবাণুসার মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্য/গুণাবলি উন্নত করে। পক্ষান্তরে, শুধু রাসায়নিক সারের একক ও অবিরত প্রয়োগ মৃত্তিকার গুণাবলি নষ্ট করে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার স্থবির বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। মৃত্তিকার স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা উদ্ধার করতে, বাড়াতে এবং সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থা ধরে রাখতে জৈব পদার্থ (যথা ঃ সবুজ সার, খামারজাত সার, কম্পোস্ট সার, নর্দমার আবর্জনা, বায়োগ্যাস স্লারি, শস্যের অবশেষ, খৈল, হাড়ের গুঁড়া, মাছের বর্জ্য ইত্যাদি) ও ফসল ভিত্তিক জীবাণুসার অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে বিশ্বব্যাপী জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে এসকল জৈব সারই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। এদেশেও রাসায়নিক সার আগমনের/আমদানির আগে (পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে জৈব পদার্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণায়ও জৈব সারের ইতিবাচক প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। জৈব সার, জীবাণুসার ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত প্রয়োগে সারের কার্যক্ষমতা, মাটির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, দেশের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির খাদ্য চাহিদা মেটাতে সঠিক নিয়ম, সময় ও ব্যবহার পদ্ধতি অনুসরণ করে মানসম্মত জৈব, জীবাণু ও রাসায়নিক সার ব্যবহার অতীব প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জি

সাত্তার এম এ, ১৯৯৭। জীবাণু সার ঃ পরিচিতি ও প্রয়োগ। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ। পৃষ্ঠা ৮০।

সাত্তার এম এ, ১৯৯৭। জীবাণু সার ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাতা, দৈনিক সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, পৃষ্ঠা ৮।

Haque, M.A., Sattar, M.A., Islam, M.R., Hashem, M.A., & Khan, M.K. 2013. Evaluation of phosphate solubilizing bacteria in relation to phosphorus solubilization and phosphatase activity. Bangladesh J. Nucl. Agric. 29: 73-84.

Saraf, C.S., Rupela, O.P., Hegde, D.M., Yadav, R.L., Shivakumar, B.G. Bhattari, S., Razzaque II, M.A. & Sattar M.A. 1998. Biological nitrogen fixation and residual effect of winter grain legumes in rice and wheat cropping systems of the Indo-Gangetic Plain. In: Kumar Rao, J.V.D.K., C. and Rego, T.J. (eds.) Residual effects of legumes in rice and wheat cropping systems of the Indo-Gangetic Plain (ISBN 81-204-1297-4). Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi. pp. 14-30.

Sattar, M.A. 1987. Progress and Prospects of Biological Nitrogen Fixation Studies in Bangladesh. Proc. IXth International Symp. on Soil Biology, Society of Soil Science of the Hungarian Society of Agricultural Science, Sopron, Hungary, August 27-30. (1985), pp. 335-344.

Sattar, M.A. 2001. Soil Microbiology. In: Mian, M.A. Wadud; Maniruzzaman, F.M.; Sattar, M.A; Miah, M.A. Aziz; Paul, S.K. and Hoque, K.R.(eds.) Agricultural Research in Bangladesh in the 20th Century. BARC/BAAG Dhaka, Bangladesh. pp. 113-123.

Sattar, M.A. 2009. Enhancing benefits of biofertilizer, chemical fertilizer and organic manures through their integrated use for sustainable agriculture. Proc. Intl. Symposium on Microbial Technologies for Sustainable Agriculture, 12-16 March, 2007, Faisalabad, Pakistan (Fauzia Y. Hafeez et.al., eds.). pp. 195-200.

Sattar, M.A. 2009. Limitation in the adoption of biofertilizer technology in Bangladesh. Paper presented at the Workshop on Advances in Bioinoculant/Biopesticide production, Formulation and Application, held at COMSTECH, Islamabad, Pakistan, 20-22 October, 2009.

Sattar, M.A. & Gaur, A.C. 1987. Production of auxins and gibberellins by phosphate dissolving microorganisms. Zentralbl. fur Microbiol. 142: 393-395

Sattar, Sattar, M.A., Islam, M.Z. & Hossain, M.B. 2000. Enhancing residual benefits of legumes through rhizobial inoculation on productivity of succeeding rice. Nuclear Sci. & Appl. 9(1/2). 33-36.

Sattar, M.A., Islam, M.Z., Hossain, M.B. & Mazid, M.A. 2002. Comparisom of liquid and peat based inocula in soybean grown at four locations of Bangladesh. Bangladesh J. Bot., 31 (2) : 107-111.

Sattar, M.A., Khanam, D., Ahmad, S., Haider, M.R., Podder, A.K. & Bhuiyan, M.A.H. 1997. On-farm experiments on rhizobial inoculants in Bangladesh: Results, problems faced and likely solutions. In: Extending Nitrogen Fixation Research to Farmers Fields (Rupela, O.P., Johansen, C. & Herridge, D.F. eds.). Proc. International workshop on "Managing legumes nitrogen fixation in cropping system of Asia" held at ICRISAT Asia Centre, Hyderabad, August 20-24, 1996 pp. 201-216.

Sattar, M.A., Podder, A.K. & Chanda, M.C. 1996. Rhizobial biofertilizers: the most promising BNF technology for increased grain legume production in Bangladesh. Proc. International Symposium on Biological Nitrogen Fixation Associated with Rice held at Dhaka, Nov. 28-Dec. 2, 1994 (Rahman, M. ed.), Kluwer Academic Publishers, DPSS 70, pp. 15-20.

Sattar, M.A., Quader, M.A. & Danso, S.K.A. 1995. Nodulation, N2 fixation and yield of chickpea as influenced by host cultivar and Bradyrhizobium strain differences. Soil Biol. Biochem., 27(4/5): 725-727.

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ